মূল্য ঃ ৫ টাকা

সত্যের পথ

যারা ভগবানকে চায় শুধু তাদের জন্য

২৩শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা

জুন, ২০২৫
জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২

সূচীপত্র

২৩শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২/জুন ২০২৫

হয়েছি স্থিত তব চরণ কমলাশ্রয়ে		৩
সত্যাশ্রয়ীর ব্রহ্মবিজ্ঞান বিস্তার	অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪
আমার মা	ভক্তি প্রসাদ	১৬
খুঁজে ফিরি ভগবানকেই	সায়ক ঘোষাল	১৬
ভগিনী নিবেদিতার বিপ্লবী চেতন	পার্থ সারথি বোস	১৭
The Diverse Paths to Realizing Brahman	Professor (Dr.) Ramaprasad Bandopadhyay	২২

সম্পাদক : **রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়**

প্রকাশক ও মুদ্রক : **বিবুধেন্দ্র চ্যাটার্জী**
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

মুদ্রণের স্থান : ক্লাসিক প্রেস
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

দাম : **৫ টাকা**

সবরকম যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি
(চতুর্থ তল)
কোলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ ঃ ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট
সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

সাক্ষাতের সময় ঃ
রবিবার বিকেল পাঁচটার পর

সম্পাদকীয়

হয়েছি স্থিত তব চরণ কমলাশ্রয়ে

ভগবানকে বরণ করতে হয় তাঁরই শ্রীচরণে নিয়ে আশ্রয়। ঐ দিব্য জ্যোতির্ময় বিশ্ব পুরুষ হয়ে রয়েছেন উন্মুক্ত-উদাস, করেছেন উন্মোচন তাঁর নিত্য নিরঞ্জন আনন্দময় প্রকাশকে এই মহাবিশ্বে। আলোর মালায় দিয়েছেন ভরিয়ে জগৎ ব্যাপ্ত সব অন্ধকারের রয়েছে যত দ্যোতনা। এই আলোর বিস্তারে হয়েছে ব্রহ্ম জ্যোতির ব্যাপ্ত বিকিরণ সব প্রাণের গভীরে, হৃদয়ের অভ্যন্তরে তন্ত্রীতে, অনুতে। আলোর ছটায় হয়ে উঠেছে অন্তর প্রদেশ গভীর আনন্দের মূর্চ্ছনায়। এখন ঐ হৃদয় তন্ত্রীর আশ্রয়ে গড়ে উঠেছে ভগবানের মন্দির। নিত্য নিবেদনের আনন্দমুখর এই চেতন যেন একান্ত বাস্তবের মাঝেই গড়ে উঠেছে উদ্‌গীথ। তব নাম মহিমায় হয়েছে ব্যাপ্ত, অব্যাক্ত হয়েছেন এখন বাক মুখরিত, ব্যাক্ত। নির্বিকার নির্বিশেষ নিরঞ্জন এখন আহ্বানের আকর্ষণে হয়ে উঠছেন তনুমাত্রায় আলোক বিস্তারী। সমগ্রতায় তিনি করেছেন ধারণ মহাবিশ্বের সব অংশ হয়ে ভরে থাকা পার্থিবের নানা উপকরণের মাঝে। এখন স্বীয় অবয়ব হয়ে উঠবে জগতের বাস্তবের কাছে হয়ে বন্ধন মুক্তির উপাদান আর নবীন ভাব প্রবাহ করে সৃষ্টি করে দিয়ে চলেছেন জীবনের কাছে আনন্দের অফুরন্ত ধারা। প্রাণের আবেদনে গিয়েছি এগিয়ে করতে চয়ন ঐ ভগবৎ ভাব নিনাদ। এখন এসেছে জীবনের কাছে হয়ে একান্ত বিকাশী আহ্বানের দৃপ্ত স্পন্দন।

মতিঃ ময়ি নিবদ্ধেয়ং ন বিপদ্যেৎ বহিঃ চিৎ।
প্রজাঃ সর্গ নিরোধে অপি স্থিতি চ অপি মৎ অনুগ্রহাৎ। (ভাগবত, ১/৬/২৪)

তোমাতেই হয়েছে যখন মনের প্রাণের নিবেদন। এসেছে আরও আহ্বান।
ঐ অনন্তের নিত্য অবস্থানে হয়েছিল যে মিলন প্রসাদ ভাবপ্রবাহ হয়েছে স্বজন
বিশ্বময় এমনই নিত্য ভাব অবস্থান দিয়েছে জীবনের অফুরন্ত প্রজ্ঞা আকর্ষণ
তোমারই প্রজ্ঞার একান্ত পরশ করছে উন্মোচন জগৎ মাঝে তোমারই কিরণ।
এখন হয়েছে ক্ষণ মনের মাঝে হয়ে উন্মুক্ত তোমারই মনে নিত্য বিকাশপর্ব
যেমনে চেয়েছো হতে ভাস্বর নিয়ে জীবনের সম্পদ তেমনই সত্য সৃজন প্রকাশে।
মহাকালের এই কাল প্রবাহ এখন দিয়েছে অবারিত আসন করে একান্ত উন্মোচন।
তোমারই সনে এখন নিবিড় আকর্ষণের দ্যোতনায় হয়েছে পূর্ণ বিকশিত ভক্তির প্রকাশ।

হয়েছে যদি প্রস্ফূটিত ভক্তিফুল জীবনের মাঝে দাও তার নিবেদন ঐ চরণ কমলে। অখণ্ড জ্যোতির এখন প্রকাশ মাধুর্য করবে পরিপূর্ণ জীবনের সব দ্যোতনা একান্ত অনুভবের অনন্ত প্রকাশ প্রবাহে। জীবনের সত্য এখন পার্থিবের আবরণ করে অতিক্রম চলেছে এগিয়ে অনাবিল ঐ প্রকাশের পর্বে। যে ভাব স্পন্দন হয়েছিল স্থিত স্থির বাক প্রকাশের আশ্রয়ে সদা লালিত, এখন তারই বিকাশ ধারা চলবে এগিয়ে জগতের সব অন্বয়কে করে গ্রহণ চলতে গিয়ে হয়ে সদাই অতিক্রম। নিত্য সনাতন মার্গ মাঝে এখনই এসেছে নবীনের ভাববিকাশ। তোমার বরণে তোমারই স্পর্শে শাশ্বত ভাবমার্গ নিয়েছে গতিময় ভাবপথ নিত্য ভাগবতী কৃপার বর্ষণে। যে ছিল-রয়েছে-থাকবে তারই এখন হয়েছে মূর্ত হয়ে নবীন ভাগবতী ভাব পথের আকাঙ্ক্ষী।

ধ্যায়তঃ চরণ অম্বুজম্‌ঃ ভাব নির্জিত চেতসা।
ঔতকান্তঃ অশ্রুঃ কলাঃ অক্ষঃ। হৃদি আসীন সে শনৈঃ হরি।। (ভাগবত, ১/৬/১১)

রয়েছি ডুবে ধ্যানমার্গে ঐ চরণ কমলের ভাবপ্রবাহের স্থিত অঙ্গে। হয়েছি সদাই মগ্ন নিত্য জীবনের এই ছন্দ প্রকাশের পর্বে কালের অঙ্গনে। পরম চেতন তুমি হয়েছ এখন একান্ত দৃপ্ত প্রকাশ আগ্রহী জীবন মাঝে। হয়েছে অশ্রু ধারার প্রবাহ এখন করেছে বরণ তোমারই আনন্দের কণা যেমন করেই হয়েছ এই জীবন পথে তোমার স্পন্দন বরণ একান্ত নিবেদন। মনের ক্ষেত্র হয়েছে বিস্ময় মালিন্যের আবরণ করে ভেদ হয়েছে একান্ত মূর্ত। মনের বিশুদ্ধতায় সব মালিন্যের কোনও কণা অবশেষ হয়েছে বিদায় এখন এমন ক্ষণেই তোমারই দর্শন স্পর্শে হয়েছে দৈবী ভাব সঞ্চার জীবনের।

প্রেম অতিভারঃ নির্ভিন্ন পূলকাঙ্গঃ ইতি নিবৃতঃ
আনন্দঃ সমপ্লাবে নিনো। ন অপশ্যম উভয়ম্‌ মুনে। (ভাগবত. ১/৬/১৭)

ভগবানের এই প্রেমভাব প্রকাশের পর্বে হয়ছি পূর্ণ নিমজ্জিত। হয়েছে এখন প্রাণ-মন-হৃদয় ভরপুর তোমারি ভালবাসার স্পন্দনে। অন্তরে করেছি দর্শন মনের একাগ্রতার ক্ষণে তোমারি ইচ্ছার প্রসাদে এখন অনন্ত প্রবাহ পথের নিত্য আনন্দের আবেগে তোমারই ভাব বন্ধনে। ঐ অসীম প্রবাহ জ্যোতির্ময়ের জ্যোতির্নিনাদ করে আশ্রয় দিয়েছ ভাববিকাশ এখন হয়ে স্থিত নিত্য প্রস্ফূটনের তোমারই প্রসাদী অনন্তকাল ব্যাপ্ত ভাবস্পন্দনে। অন্তর মাঝে গিয়েছে যখনই দৃষ্টির সংযোগ হয়েছে মূর্ত নবীন ভাবপথ

এই জগতর ব্যাপ্ত সত্যের কণায় কণায় হয়েছ তুমি যুক্ত তোমারই এই জীবন মাঝে। এখন জগৎ জন করবে বরণ ভগবানের এই নবীন ভাব মাধুর্যে হয়ে মণ্ডিত প্রকাশ পথে। যে ভাবধারা ছিল একান্তভাবে সুপ্ত এখন হয়েছে সে জাগ্রত জগৎময় হতে বিস্তারী।।

—ঃঃ—

সত্যাশ্রয়ীর ব্রহ্মবিজ্ঞান বিস্তার

অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপময় ভগবান নানারূপে মানবের ভক্তি-নিবেদনে স্বরূপে ধরা দেন। আবার পরম অদ্বৈত অনির্বচনীয় হয়ে সেই তিনিই অনন্ত অসীমে হয়ে ব্যাপ্ত সাধন চিত্তের সমাধির কালাতীত মহাকাল স্পন্দনে চৈতন্যে দীপ্ত হয়ে ফুটে ওঠেন। রূপবান ভগবানই আবার রূপবিহীন সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন। তিনি স্বয়ং মহাকাল দেবাদিদেব রূপে রূপবান হয়ে কালের স্পন্দন জগতের বুকে দান করেছেন তাঁরই স্পন্দনের দৈবী বৃত্তের মধ্যে হয়ে উঠতে একান্ত বিস্তৃত দৈবী চেতন প্রবাহের অগ্নিদীপ্তি জগৎ মাঝে ভরিয়ে তুলেছেন প্রাণের প্রদীপ আর দিব্য স্পন্দন দিয়ে।

বায়ুঃ বাব সংবর্গঃ যদা বৈ অগ্নিঃ উৎবায়তি।
বায়ুম্ এব অপি এতি যদা সূর্যঃ অস্তম এতি।
বায়ুম এব অপি এতি যদা চন্দ্রঃ অস্তম এতি।
বায়ুম এব অপি এতি।। (ছা. উ. ৪/৩/১)

বায়ু রূপেই তিনি হয়েছেন জগৎ সমীপে ভাস্বর সব জীবের জীবনে। বায়ুর দেবতা তিনি দিব্য রাজ বৃত্তের মাঝে ঘটিয়ে দিয়েছেন অনন্ত ভাবধারার অনাবিল এক ভাব প্রবাহ। এইসব প্রাণের মালা গেঁথে দিয়েছেন হয়ে মাতৃরূপা এই সৃষ্টির রথকে আগামীর পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে। ভক্ত গীতকার তাই সঙ্গীতের অর্ঘে নিবেদন করলেন জগন্মাতা মহাকালীর সমীপে— 'ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন এই মুণ্ডমালা কোথা পেলি?' অনন্ত প্রসারী মহাশূন্যের পরম ব্যোমে বিরাজমান শূন্যরূপ বরণ করতেই দেবাদিদেব সৃষ্টির রথকে কালের স্পন্দনে দিয়েছেন এগিয়ে। জগন্মাতা মহাকালির ক্রোড়ে দিয়েছেন এই সৃষ্টির রথকে আগামীর প্রবাহে নিয়ে যেতে।

যদা আপঃ উৎ শূষ্যন্তি বায়ুম এব অপি যান্তি
বায়ুঃ হি এব এতান্ সর্বান্ সংবৃক্ষন্তে। ইতি অধিদৈবতম্।। (ছা. উ. ৪/৩/২)

ঐ বায়ুর আবহে সব দেবরূপ এখন ক্রম বিকাশে গড়ে উঠছে সদা চৈতন্যের প্রসারিত পরশে অনন্তভাব প্রাচুর্যে। একান্ত এই ভাবপ্রাচুর্য হয়ে উঠবে প্রতিটি জীবনের একান্ত নিজস্ব কালপ্রদীপ। মহাকালের কালপ্রদীপ প্রাণপ্রদীপ হয়ে প্রাণসঞ্চার করেছে জীবনের সূচনায়। বায়ু হয়েছেন—প্রাণের সঞ্জীবনী। দেবলোকের গড়নে হয়েছে আদিত্যের আলোক বিস্তার আর বায়ুর প্রবহমান প্রাণশক্তি। যেমন করে হয়েছে কালের গতির সূচনা দেবী মহাকালী ঐ জীবন প্রয়াসের দীপ্তি বরণ করে নিয়েছেন জীবনের চলমান পথের অভিমুখে। মহাকালীর কৃপার আবরণ দেবলোক মনুষ্যলোক ও অন্যান্য সকল লোকের মাঝে করে রেখেছেন জীবনের অন্বয়। দেববৃত্তের বিকাশ সব জীবের জীবন মাঝে অনন্ত মহাসত্যের নিত্য দীপ্তির মহিমায় বরণ করে নেবেন।

অথ অধ্যাত্মম প্রাণঃ বাব সংবর্গঃ।
সঃ যদা স্বপিতি প্রাণম্ এব বাক অপি এতি।
প্রাণম্ চক্ষুঃ প্রাণম্ শ্রোত্রং প্রাণং মনঃ।
প্রাণঃ হি এব এতান্ সর্বান্ সং বৃঙক্তে ইতি।। (ছ. উ. ৪/৩/৩)

মানব কূলের জীবন বার্তা এসেছে মহাপ্রাণের প্রাণের সূচক হয়েছে ঐ মহাশক্তির নিজেরই কৃপার দান। অনিবার্য বিকাশের তরে হয়ে উঠবে বিকশিত স্বয়ং। বায়ুর যেমন সর্বত্র বিস্তার তেমনি আত্মা রূপ বরণ করে নিয়ে পরমাত্মা স্বয়ং জীবনের মাঝে সর্বদাই একান্ত প্রকাশের স্তরে হয়ে উঠবেন বিন্যস্ত। যেমন করেই হয়ে উঠবে জীবন মাঝে প্রাণের স্পন্দন তেমনই মহাপ্রাণের দান করে গ্রহণ এক একটি প্রাণ দিব্য ভাবময় জীবন প্রদীপ হয়েই স্বতঃই হবেন বিরাজমান। যে অখণ্ড সত্য — সব প্রাণ - সব জীবনে হয়ে প্রবিষ্ট নিজের পরিচয়ের স্বতঃ দীপ্তি বরণ করে নিয়েছেন এখন হবেন মূর্ত তিনিই জীবনে।

তৌ বা এতঃ সংবগোঃ বায়ুঃ এব দেবেষু প্রাণঃ প্রাণেষু।। (ছা. উ. ৪/৩/৪)

প্রাণবায়ু হয়েই বায়ুদেবতা সব জীবনের দায় বরণ করে নিয়েছেন এই বার্তার প্রসঙ্গে। প্রাণের প্রদীপ্তে হয়ে জগৎময় বিস্তৃত কিরণসমূহের মধ্যে হয়ে চলবে নিয়তই প্রাণের ভাবস্পর্শে। যা কিছু হয়েছে প্রাণের মাঝে হয়ে বিস্তৃত, সদা গতিষ্মান প্রাণ প্রদীপ

তারই যুগপৎ ছন্দের নন্দনে হয়ে উঠবে পার্থিব বিকাশের অঙ্গ শক্তিময়। এখন জীবন চলবে এগিয়ে একান্ত এই আত্ম পরিচয়ের ভাবনার প্রদীপ হয়ে উঠবে জীবনে চেতন সত্তার এখন হয়ে উঠবে জাগ্রত, দিব্য ভাবময়। মহাকালীর এখন জগৎ স্পন্দনের বার্তা প্রাণে প্রাণে হয়ে চলেছে সঞ্চারিত। ঐ পরম জ্যোতির্ময় তিনি কালছন্দের একেবারেই অনুহত পরমাণুতে শক্তি হয়েছে সংহত। এখন ভগবানকে চিনে নাও নবীন ভাবপ্রকাশ ক্ষণ পর্বে।

ভাগবতী জ্যোতি স্নাতঃ

বৈশ্বানরং বিশ্বহা। দীদিবাংসং।
মন্দ্রৈঃ অগ্নিং কতবিম্ অচ্ছা বদাম্ঃ।
যঃ মহিম্না পরিবভূবঃ।
উর্বো উতঃ অবস্তাদ্ উতঃ দেবঃ পরস্তাৎ।। (ঋ. বে. ১০/৮৮/১৪)

ঐ অগ্নির দীপ্তির জীবন মাঝে এনেছে দ্যোতনা।
সময়ের এই গতিময় প্রবাহে হয়েছে জীবনের এই ক্ষণে।
এই চেতনার মূর্ত প্রবাহ হয়েছে জগতের জীবপ্রাণের আবহ।
যে পেয়েছে চেতনার পরশ হোক তারই নিত্য বিকাশ।
ঐ অনন্ত ভাবধারায় হোক স্নাত সব জীবন চেতন।
যে প্রাণ মন হৃদয় হয়েছে জীবনের ধারক হোক তারই বিস্তার।
মহান প্রাণের প্রবাহ এখন হয়েছে জীবনের এই স্বতঃ বিকাশে।
অনন্ত শক্তির অনন্ত ভাববিকাশ হয়েছে জীবনের সম্পদ।।

দেবচেতনের মনোবিকাশের এই মুক্তির পথে ঃ

দ্বে স্রুতো অশৃনবং পিতৃনাম্ অহং।
দেবানাম উত মর্তানাম।
তাভ্যম ইদম্ বিশ্বং এজৎ সম এতি।
যৎ অন্তরা পিতরং মাতরং চ।। (ঋ. বে. ১০/৮৮/১৫)

কর্মের বন্ধনে হয়েছে জীবের পরিচয় প্রকট।
যেমন করেই এসেছে জীবন মাঝে কর্মের প্রবাহ উন্মোচন।
হয়েছে নবীন ভাবনার দীপ্ত প্রকাশ অন্তর প্রবাহে।
যেমন করেই হয়েছে ভাগবতী ভাবরাজ্যের নিত্য প্রভা।
দেব মার্গের নিত্য ভাবস্রোতে এসেছে যে আহ্বান প্রভা
হয়েছে সে মূর্ত নিজ কর্মেরই আবর্তে জীবন সকাশে।
আসক্তি হয়েছে যখন শূন্য পরিণাম রচনায় কর্মপথে।
হোক কর্মের উদার যোজনা করে পরিনামে নিবেদন ভগবানে।।

ভাগবতী ভাবপথে হয়েছি যুক্ত ঃ

দ্বে সমীচী বিভৃত অক্ষরন্তং
শীর্ষতী জাতং মনসা বিসৃষ্টম্।
স প্রত্যঙ্ বিশ্বা বূবনমানি তস্থৌ।
অব প্রযুচ্ছন্ তরণীঃ ভ্রাজমানঃ।। (ঋ. বে. ১০/৮৮/১৬)

শীর্ষ প্রজ্ঞা স্থানে এসেছে এখন প্রত্যয় প্রবাহ।
জীবনের এই অনন্ত ভাবপ্রবাহ একান্তে করেছে সৃষ্টি।
জীবন চলনের গতি প্রবাহ হয়েছে এখন নিত্য নিত্যই পরিপূর্ণ।
মস্তিষ্কের ভাবনার জানা যুক্তির প্রবাহ করেছে আহ্বান।
মনের গভীরে ভাবনার দীপ্তি খুঁজেছে প্রত্যয়ের ক্রম বিস্তার।
এখন জীবন প্রদীপ চায় বিলিয়ে দিতে কর্মের দীপ্তি প্রভা।
যে বিশ্বাস বহ্নি দিয়েছে শক্তির সূত্র জীবন মাঝে হোক তার বিস্তার।
অনন্য ভাব সংবেদ আসুক জীবনের মাঝে অখণ্ডের খণ্ড মিলনে।।

উদার আহ্বানে কর্মপথে ঃ যত্রা বেদেতে অবরঃ পরশ্চঃ।
যজ্ঞঃ অন্যৌ কতরৌ নৌ বিবেদ।
আ শোকুরত সধমাদং সখায়ৌ।
নক্ষন্ত যজ্ঞং ক ইদং বি বোচন।। (ঋ. বে. ১০/৮৮/১৭)

ভাগবতী পথের কর্ম নিবেদনে হয়েছে স্বতঃই স্বপ্রকাশ।
জীবন পথে ভাববিকাশ এসেছে বিশ্বাসের সরনিতে মনের মাঝে।
স্পন্দন সব এসেছে যেমনে জীবনের নিত্য প্রবাহ মার্গে
তেমনি এসেছে আহ্বান ঐ অনন্ত বিকাশী ভাবপ্রবাহে।
দেববন্ধু তুমি এসেছ এখন জীবন মাঝে তোমায় করতে বরণ।
এখন কালের প্রবাহমানতায় এসেছে তোমারই সেবাকর্ম হয়ে মগ্ন।
যে ভাবদীপ্তির এখন হয়েছে প্রকাশ বিশ্বাসের এই আবহে
ভগবানে করে বরণ হোক তারই নিত্য বিকাশ জীবন পথের এই প্রবাহে।।

জীবনের সব ক্ষেত্রই ভরপুর হয়ে রয়েছে ভগবানের স্পর্শ নিয়ে। যা কিছু হয়ে চলেছে প্রাণের স্পন্দন সবই ভাগবতী প্রভায় হয়ে রয়েছে ভরপুর। এখন পঞ্চকোষের পঞ্চ ভাগবতী ভাব বিকাশ জীবনের অঙ্গে অঙ্গে। ভগবান স্বয়ং তাঁর সাধনপ্রবাকে করেছেন সদা বিস্তৃত।

অথ হ শৌনকম্ চ কাপেয়ম্
অভিপ্রতারিণম্ চ কাক্ষসেনিম্ পরিবিষ্যমানৌ
ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে তস্মা উ হ ন দদতুঃ।। (ছা. উ. ৪/৩/৫)

অন্নময় কোষকে ইংরাজী তর্জমা করতে গিয়ে একে Material Sheath বলা হয়েছে। সাধারণভাবে অন্নময় কোষ জড় মাত্রার ধরা হয় এজন্যই এমনভাবে ভাবনা এসেছে জীবন মাঝে। এমন ভবনার মূলে রয়েছে এই অন্নমান যে অন্ন রূপে প্রতিপন্ন হয় যখন কোন বস্তু তার প্রাণসত্ত্বা সেখান থেকে চলে যায়। আপাত দৃষ্টিতে সেটি সত্য। অন্নগ্রহণ যখন করেন মানুষগণ তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে এই অন্নই নিষিক্ত হয়ে প্রাণশক্তিকে ভরিয়ে তোলে। অন্নময় কোষ এজন্যই বিশেষ ভাবে জগৎময় ব্যাপ্ত হয়ে থেকেও জড় পরিচয় বরণ করে নিয়েছে। অন্ন যদি নিছক জড় হয়ে থাকে তবে প্রাণের সঞ্জীবনী এগিয়ে দেবার সামর্থ তার হয়ে ওঠে না। অন্নের প্রতিটি কণার মধ্যেই নিহিত থাকে প্রাণশক্তিরই উৎস। এই প্রাণশক্তির সব পরিচয় পাওয়া যায় না। জীবনের মাঝে প্রথমে নিহিত যে জীবনের শক্তি তার ক্রমবিকাশ এই অন্নের মাঝেই বিদ্যমান। ঋষিগণ এটি উপলব্ধির পথে বুঝে নিয়েছেন যে অন্নের মাঝে যে প্রাণশক্তি তারই রয়েছে আগামীর পর্বে হয়ে ওঠা দৃপ্ত এক একটি শক্তির কণা।

সঃ হ উবাচ মহাত্মনঃ চতুরঃ দেব একঃ
কঃ সঃ জগার ভুবনস্য গোপাঃ ত্বং কাপেয়
ন অভিপশ্যন্তি মর্ত্যাঃ অভিপ্রতারিন্। বহুধা বসন্তম্।
যস্মৈ বৈ এতৎ অন্নম্ তস্মৈ ন এতৎ দত্তম ইতি।। (ছা. উ. ৪/৩/৬)

ঋষিগণ ধ্যানের তন্ময়তায় প্রকৃত সত্যকে বুঝেছেন। অন্নের পরিচয় জীবনের প্রবহমানতায় যখনই হয়েছে তার পরিপূর্ণতার পথে এগিয়ে নিয়ে জীবনকে তার কালপর্বের চলমানতার মধ্যেই প্রতিষ্ঠা করে নেওয়া। যে জীবন প্রবাহ এখন ক্রম পর্যায়ে চলবে এগিয়ে তারই অনন্যতার ভামাধুর্যকে বরণ করে এগিয়ে প্রাণশক্তি নিয়ে প্রাণ পরিচয়। এই প্রাণ পরিচয় একান্তভাবে জীবের জীবন চেতনকে গড়ন করে দেয় প্রাণশক্তির প্রবাহ। প্রাণশক্তির এই নিত্য প্রবাহই জীবের মনের পরিবেশকে গড়ে তোলে। মনের পরিবেশের রয়েছে উভয় সর্বত্র সঞ্চারণশীল হওয়ার জন্য। জীবন চৈতন্যময় এ জন্যই জীবনের সব অঙ্গও চৈতন্য পরিবেষ্টিত।

তৎ উ হ শৌনকঃ কাপেয়ঃ প্রতিমশ্বানঃ প্রত্যেয়ায়।
আত্মা দেবানাং জনিতা প্রজানাম্ হিরণ্যদ্রষ্টুঃ বভসঃ।
অনসুরিঃ মহান্তম অস্য মহিমানম্ আহুঃ অনদ্যমানঃ।

যৎ অনন্নম্ অতি ইতি বৈ বয়ম ব্রহ্মচারিন্ আ উপাস্মহে
দত্ত অস্মৈ ভিক্ষামঃ ইতি।। (ছা. উ. ৪/৩/৭)

ঋষি শৌনকের পক্ষে অন্ন প্রাপ্তির বিষয়টি হল চেতনার ক্রম সঞ্চারের ও চেতনার ক্রম পরশকে বরণ করে নিয়ে সম্মুখের দিকে এগিয়ে চলা। জীবন স্বতঃই চেতনার দ্বারা হয়ে চলে পরিচালিত। চেতনার একটি দিক হল তার জগৎ চৈতন্য আর অন্যটি হল তার জীবন মাঝে ব্রহ্মচৈতন্যের দীপ্তি। ব্রহ্ম চৈতন্যই সার্বিক। অবশ্য সাধারণ বোধগম্যভাবে পরিবেশনের জন্য এটি স্বতঃ বিকশিত হয়ে চলে যে এই যে এই দিব্য প্রকাশের অনুভব জীবন মাঝে সঞ্চারিত হয়ে ব্রহ্মবার্তাই ছড়িয়ে দেবে। বিজ্ঞানের জড় পরিচয়টি হয়ে রয়েছে পদার্থের জন্য। মানবের অস্তিত্বের পরিচয়ের ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে ঐ জড় মাত্রাটি চৈতন্যদীপ্ত হয়েই ফুটে উঠছে জীবনের সব ক্ষেত্রে।

"The cell is the triumphal example of this solution (matter us. consciousness). It has an outer membrane to protect the intricate structures within and complex metabolic pathways that process outside material into internal structure. At the centre of this complex system sits a carefully coded DNA molecule, or a family of them, the director of the cellular activity. Such cells now dominate the earth. All competitors have been sweft aside by their phenomenal success. With the emergence of the cell, We have what fits our standard conception of life – a self-maintaining, self-replicating, energy using system.'

The emergence of conscious intelligence, as one aspect of the living matter, must be seen against the biological evolution in general.

(Church land, Paul, M. Matter and consciousness, Ch. 7, p. 192, Revised Edition, A Bradford Book, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, 2013)

ঋষি জেনেছেন, ভগবান স্বতঃই চেয়েছেন ঐ চৈতন্যের দীপ্তি জীবন মাঝে করতে সদা সঞ্চার। মানবের জীবনে দেহ পরিচয়ের প্রতিটি কোষেরই পরিচয় এমন যেন এই প্রতিটি কোষই জীবনের সামগ্রিক বার্তা বহন করেই চলেছে এগিয়ে। যা কিছু হয়েছে জীবনের স্বতঃ পরিচয় সে সবই চৈতন্য বিধৃত। প্রতিটি কোষের মধ্যে যে প্রাণ সঞ্চার ও প্রাণের গতি রয়েছে নিহিত তাদেরই হয়ে উঠবে জীবন পথের এগিয়ে চলবার চলমান এক বিশেষ চৈতন্যপ্রদীপ।

কর্মের প্রবাহ পর্বে দেববন্ধন ঃ কর্তুঃ অগ্নয়ঃ কতি সূর্যাসঃ।
কতুঃ উপাসঃ কত্যুঃ স্বিদ্বীপঃ।
তোপঃ এষঃ বঃ পিতরঃ বদামি।
পৃচ্ছামি বঃ কবয়ো বিদ্মনে কম।। (ঋ. বে. ১০/৮৮/১৮)

ভাবনার দীপ্তি হয়েছে এখন অগ্নিময় জীবনের পথে।
ঈশ্বরে করে ন্যস্ত জীবনের যা কিছু নির্মল সব ভাবনায়।
আলোর বিকাশে এখন জীবনের পর্বে জেগেছে দেবপ্রজ্ঞা।
এখনই এসেছে আলোর দীপ্তি নিত্য প্রকাশের ধারায় জগৎ মাঝে
সাধন পথের এই ব্যাপ্ত বিকাশ হয়েছে মূর্ত গভীরে।
ভগবৎ ভক্তির এখন জেগেছে ক্ষণ ভাগবতী ভাব বিস্তার প্রয়াসের।
ভাগবতী ভাবপ্রবাহ এখন জীবনের কর্ম-জ্ঞানের সমন্বয় প্রয়াসী
কর্মচেতন প্রভা হোক মূর্ত জীবনের এই ভাব বিস্তার ক্ষণে।।

জীবন ব্যাপ্ত অগ্নি যজ্ঞে ঃ যাবন মাত্রম উষসৌ ন প্রতীকং।
সুপর্ণো বসতে মাতরিশ্বঃ।
তাবৎ উধাত যজ্ঞমায়ন।
ব্রহ্মণঃ হেতুঃ অবরৌ নিষীদন্।। (ঋ. বে. ১০/৮৮/১৯)

যজ্ঞের অম্রিয় স্রোত প্রবাহ হয়েছে উন্মুক্ত জীবনে।
উষার রথে হয়েছে প্রকাশবান আদিত্য দেবতার গুণবার্তায়।
গতিষ্মান হয়েছে এখন মানবের চেন-বিকাশ ভাবধারাকে।

যেমন হয়েছে চেতনার বিকাশ ভগবৎ ভাব বিকাশ জগতে।
ভগবৎ ভাববিকাশ অনন্ত ভাব বিগ্রহ মহাশূন্যে।
এখনই এসেছে নবীন ভাবস্পন্দন চেতনার এই বিশেষ প্রকাশে
মন্ত্রের প্রবাহ হয়েছে যদি মনের মাঝে হয়েছে আবেশ।

দৈবী রাজবৃত্তে
সাধন চেতন ঃ

ইন্দ্রং সুবা নৃত্রং সঙ্ক একম বিশ্ব ব্যাপ্ত।
বিববাধৈঃ রোচনা শ্বি জন্মৌ অন্তান।
আ যঃ পপ্রৌ বিশব জলন্ত সদা অঙ্গীকারে।
প্র সিন্ধুভ্যঃ রিতিবানো মহিত্বা সদা। (ঋ. বে. ১০/৮৯/১)

এখন হয়েছে উদ্ধার
এসেছে এই বিপুল ভাবগ্রাহ্য বিকাশ সূর্য
এখন অনন্য ভাববিকাশের সূচনায় সময়ের এই নিত্য
এই অন্ধময় হয়ে উঠেছে দৃপ্ত প্রকাশের ভাব স্পন্দন জীবন মাঝে।
দেবরাজ হয়েছে এখন জগৎ প্রকাশের চেতন বন্ধু জীবনে।
জীবনের শক্তি এখন হচ্ছে জীবনের সূত্র পথের প্রকাশে।
চিত্র জীবনের এই সনাতনী প্রজ্ঞা এখন হয়েছে নিষিদ্ধ এখন
চিন্তান্ধ এই জীবনের কর্মপথ হয়েছে মুক্ত সদা স্পন্দনে।
বিরাট কর্মের এই অঙ্গনে হয়েছে ভাববিকাশের সুর অঙ্গন।

দিব্যক্ষেত্রে জগৎময় ব্যাপ্তি ঃ

সংসূর্যঃ পর্যু বরাংশ।
ইন্দ্র ববৃত্যান্ রথ।
কৃষ্ণান্দ তমাংসি বিদ্বান।। (ঋ. বে. ১০/৮৯/২)

আনৌ উপকরণ এই অনন্ত ভাবসঞ্চার প্রয়াসে।
দেবতার অফুরন্ত কৃপার প্রাপ্ত শ্বি ভাব পর্বে।
আলোর শ্রীরুদ্রা হয়েছে জীবনের এই ক্ষয় সাধন ক্ষেত্রে।
এসেছে সময় বহু কালক্ষেত্রের বার্তা সদা প্রকাশে।
এখন জীবন মাঝে ঐ আলোর পথ চ
দিব্য সম্ভার এখন জীবনের নবীন রঙের গড়নে হয়েছে যুক্ত।
বিশ্বাসের দৃঢ়তায় মানবিক সীমার পূরণই স্বতঃ আবিষ্ট।

জীবন প্রকাশের এই ক্ষণ আনুক স্বতঃই।

ঋষির দৃষ্টি ছিল সার্বিক। সমগ্রতায় হয়ে ভরপুর এই বিশ্বের সর্বত্র যে মহাসৃষ্টির পরশ ও বিস্তার হয়ে রয়েছে সবেতেই রয়েছে ভাগবর্তী স্পর্শ। ভাগবতী স্পর্শ ও প্রকাশ হয়ে চলেছে অন্নময়-প্রাণময়-মনোময় কোষের মাঝে হয়ে বিস্তৃত। স্বতঃই সদা বিস্তারের এই পর্বে পর্ব কণা অস্তিত্বের মাঝে যেমন ব্রহ্ম পরশ অতি ক্ষুদ্র মাত্রায় অদৃশ্যের অলক্ষে। এই ব্রহ্ম প্রকাশ আর ব্রহ্মের মহাজাগতিক ব্যাপক বিস্তৃত প্রকাশ একই মাত্রায় ভাগবতী। ভগবান স্বয়ং এই অনন্ত প্রকাশ মাঝে অনন্য শক্তিরূপে সব অস্তিত্বে হয়ে রয়েছেন সদা ব্যাপ্ত। এমনই বিস্তৃত হয়ে রয়েছে নিত্য বিকাশের অনন্য শক্তির বিশেষ প্রকাশে। একই প্রকাশের বিভিন্ন মাত্রা রয়েছে বিশ্বমাঝে স্বাতন্ত্রের দীপ্তিতে হয়ে ভরপুর। একান্ত বিস্তারে হয়ে রয়েছে প্রকাশ পর্বের সব রূপ অনন্যতায় স্বাতন্ত্রের বিকশিত হয়েও সর্বদাই সমন্বিত ঐ মহাশক্তির সঙ্গে। ভগবান স্বয়ং প্রকাশ। তিনি নিজেই জীবের হৃদয়ের দরজায় এসে যান তারই দিব্য স্পন্দন আর বার্তা নিয়ে।

তস্মৈ উ হ দদস্তে। তৈ বৈ এতে পঞ্চ অন্যে
পঞ্চ অন্যৈ দশঃ সন্তঃ তৎ কৃতম্।
তস্মাৎ সর্বাসু দিক্ষুঃ অননম্ এব দশ কৃতম্

সা এষা বিরাট অন্নাদী। তয়া ইদম্ সর্বং দৃষ্টং।
সর্বম্ অস্য ইদম্ দৃষ্টং ভবতি অন্নাদঃ
ভবতি যঃ এবং বেদ যঃ এবং বেদ।। (তৈ. উ. ৪/৩/৮)

দৃষ্টি-শ্রুতি-ঘ্রাণ-বাক-স্পর্শ—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ক্রিয়া করে চলে ভূমি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম — এই পাঁচটি মহাভূত প্রাকৃত মাত্রার উপর। প্রক্রিয়াটির মধ্যে রয়েছে বেশ কয়েক প্রকারের অংক। প্রথম ধাপের অংকটি হল সমানে সমান। একটি জ্ঞানেন্দ্রিয় একটি ভূতমাত্রার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্রিয়া করে। যেমন, বাক। বাক্ সাধারণভাবে ক্রিয়া করে মনের উপর। মনের দরজায় যদি কোনও রকমভাবে প্রতিরোধ থাকে তবে বাক্ অক্ষম হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে বাক আশ্রয় নেয় শ্রুতি-দৃষ্টি-স্পর্শের সব অনুভূতি-স্পন্দন ও প্রকাশকে অবলোকন করে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাওয়া সত্যের উন্মোচন ও প্রসারের জন্য। বাকই অন্ন হয়ে অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে যে সংবেদ সৃষ্টির করে সেটি জীবনের বিকাশ ও সঞ্চালন পথের জন্য হয়ে ওঠে নিত্য দিনের আকর্ষক। মহাপ্রকৃতি পরিচয়ে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে চলেছেন এগিয়ে স্বয়ং জগন্মাতা। তাঁরই প্রচেষ্টার শক্তি, ইচ্ছার বিকাশ এ সবই ঘটে থাকে ঐ অনির্বচনীয়, অসীম-মহাশূন্য-মহাব্যোমে ব্যাপ্ত মহাকালের ইচ্ছা প্রদীপ হয়ে জীবনে ব্যাপৃত হতে।

সত্যকামঃ হ জাবালঃ জবালাম্ মাতরম্ আমন্ত্রযাঞ্চ উক্তেঃ।
ব্রহ্মচর্যং ভবতি বিবৎস্যামী কিং গোত্রঃ নু অহম্ অস্মি ইতি।। (তৈ. উ. ৪/৪/১)

ভগবানই সব কোষে কোষে ছড়িয়ে রয়েছেন প্রতিটি জীবের মাঝে, অন্তরের চৈতন্য-প্রদীপ রূপে সদা ভাস্বর হয়ে। অথচ এই সত্যটিকে প্রয়াস ব্যতিরেকে জানা যায় না। প্রয়াস এমনই হতে হয় যে জীবের জীবনময় ছড়িয়ে থাকে তারই স্বতঃবিকাশ পথকে করে দিয়ে উন্মোচন। উন্মোচনের পথটি ব্রহ্মবিজ্ঞান ও ব্রহ্ম বিকাশের এই পর্বের মাঝে হয়ে ওঠে প্রস্ফুটিত। ঋষিগণ যে সাধন চর্চা রেখেছিলেন পরম্পরার তন্ত্রীতে প্রজ্ঞা বিস্তারের জন্য সেটির মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠবে জীবনের ব্যাপ্ত প্রকাশ। ব্রহ্মচর্য-গাহস্থ-বানপ্রস্থ-সন্ন্যাস — এই চারটি পর্বের মধ্য দিয়ে যে জীবনের প্রগতি তারই মাঝে হয়ে রয়েছে প্রস্তুতির বহু ব্যবস্থা। ব্রহ্মচর্যকে অবলম্বন করে যাত্রাপর্বের শুরু। ব্রহ্মচর্য হল জীবনের একটি অবস্থা যার মধ্য দিয়ে প্রস্তুত হয়ে যায় মন-প্রাণ-হৃদয়। যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম এই পর্ব সবের মিলিত অবস্থা রয়েছে যার উদ্দেশ্য সত্যলাভের জন্য নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলে।

সা হ এন স উবাচ ন অহম এতৎ বেদ তাত।
যৎ গোত্রঃ ত্বম অসি। বহুঃ অহম চরন্তী
পরিচারিণী যৌবনে ত্বাম অলভে।
সা অহম এতৎ ন বেদ যৎ গোত্রঃ ত্বম্ অসি
জাবালা নাম তু অহম অস্মি সত্যকামঃ নাম ত্বম অসি
সঃ সত্যকাম জাবালঃ ব্রুবীথঃ ইতি।। (তৈ. উ. ৪/৪/২)

সত্যলাভের জন্য যে মনে-প্রাণে জেগেছে আকূতি সে চলবে এগিয়ে ক্রমপ্রস্তুতি ও পরিণতির দিকে। ব্রহ্মচারীর জন্য কয়েকটি প্রয়োজনীয় বার্তা ঃ

(১) ব্রহ্মচারী হবে সেই মন-প্রাণ যার মধ্যে ক্রমে গড়ে উঠবে ক্ষীণ মাত্রায় যদিবা সূচনা হয়ে থাকে ক্রমে ঘনীভূত ও দৃঢ় হয়ে উঠবে ব্রহ্মজ্ঞান আর ব্রহ্মলাভের জন্য দৃঢ় অভীপ্সা।

(২) ব্রহ্মচারী হয়ে উঠবে সেই মানব চেতন যার মধ্য থেকে কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মাদ মাৎসর্যের প্রভাব ক্রমেই চলে যাবে। প্রতিটি পর্বে প্রয়াস ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ব্রহ্মচারী জীবনকে সংযম ও নিয়মের গণ্ডী দিয়ে শুরুতে ধরে রাখবেন—যত সময় পর্যন্ত নিজ চরিত্র ও ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এটি ফুটে ওঠে।

(৩) ব্রহ্মচারী হবে সেই মানব জীবন যার অন্তরে জেগেছে ভগবানের জন্য আকর্ষণ। এমন আকর্ষণ গড়ে উঠবে সে জীবনে যার মধ্যে স্থির নিশ্চিতভাবে ভগবানের জন্য মিলন আগ্রহ হয়ে উঠবে জগৎ মাঝে ঐ অনন্ত ভাব বিস্তারের পটভূমি করবেন নিজস্ব মন ও প্রাণের ভাবপর্বে জাগ্রত। সদা আগ্রহী হয়ে ভগবানকে বরণ করে জীবনের চিন্তা-কর্ম সম্পাদন হয়ে চলবে।

দিব্য সাহচর্য্যে শক্তি ঃ

সমানম অস্মা অনপ আবৃত চঃ।
ক্ষময়া দিবঃ অসমং ব্রহ্ম নব্যম্।
বি যঃ পৃষ্টেব কনিমানি অর্য।
ইন্দ্রঃ অক্ষিকায় ন সখায়াম্ এষঃ।। (ঋ. বে. ১০/৮৯/৩)

আলোর বার্তা এসেছে জীবন মাঝে হয়ে দেবতার দান।
অন্য ভাবনার ভাবস্রোতের হোক স্তর বিন্যাসের শক্তি সঞ্চারি।
এখন মন্ত্রের সাধন করবে ব্যাপ্ত অভীপ্সার ক্রম সঞ্চারে।
হয়েছে ঐ নিত্য প্রবাহের নবীন তাৎপর্য জীবনের দিব্য সংস্থানে।
যে ভাবদীপ্তি ছিল জীবন অঙ্গ সমূহের অঙ্গীকারে হোক তার স্থিতি।
মন্ত্রের নিবেদন জীবনের কণা সমূহে হবে নিত্য চেতনের স্ফূর্তি।
মন-প্রাণ-হৃদয়ের সব তন্ত্রীতে হোক ধ্বনিত ভগবৎ নামগুণগান
যেমনে ছিল ঐ ভাবদীপ্তি পৃথিবীর বুকে হোক তার মিলন ধ্বনির সঞ্চার।

ভাগবতী করুণায় ঃ

ইন্দ্রায় শিরঃ অনিশিত সর্পাঃ।
অপঃ প্রেরয়ং সগরস্য বুধ্নান।
যঃ অক্ষেন এব চক্রিয়া
শচীভিঃ ভষ্মকঃ ততঃ অন্তঃ পৃথিবীঃ অমুর্ত দ্যাম। (ঋ. বে. ১০/৮৯/৪)

দেবতার তরে করেছি মন্ত্র নিবেদন অন্তর প্রদেশে স্বতঃই।
হয়েছে ঐ ভাব প্রণয়িনী সাধন চেতন জীবনের উন্মেষতার।
এখন এসেছে জীবন মাঝে নিত্য বিকাশের প্রকাশ মাত্রা
ভগবৎ ভাবে হয়ে ভরপুর হয়েছে উপলব্ধির সদা প্রকাশ
এখন হয়েছে দিব্য ভাবে বিভাসিত জীবন ছন্দ মূর্ত জগতে।
ভগবৎ ভাব ও ছন্দের সাধন হোক দৃঢ় বিশ্বাস আর নিবেদনে পূর্ণ
অখণ্ড সাধন ব্রত মননে চিন্তনে হোক জীবনময় সদা ব্যাপ্ত।
যে প্রজ্ঞার বার্তা পেয়েছে জীবন হয়েছে তারই মোক্ষ পথ বরণ।

অনুভবের স্রোত প্রবাহে ঃ

আপান তৎ অন্যতঃ উপল প্রভর্মাঃ।
ধূনি শিমীবান্ দৃপল প্রভর্মা শরুমান্ ঋজীসী।।
সৌমৌ বিশ্ব অন্যর্তঃ সা বনানি।
নাবার্ক ইন্দ্রং প্রতি মনানি দেভুঃ।। (ঋ. বে. ১০/৮৯/৫)

সাধন পথে চলতে এগিয়ে দিব্য বার্তা এসেছে সংবেদে।
ভগবৎ চেতনের প্রবাহ এখন হয়েছে দিব্য চেতনের অঙ্গীভূত।
পর্বে পর্বে দেবতায় করে আহ্বান হয়েছে দিব্য চেতন জাগ্রত
এই প্রবাহ পর্বেই হয়েছে ভাগবতী ভাব আহ্বান-অন্তরে।
তোমারই স্পন্দন চেয়েছি হতে বিস্তার জগতের চেতন পথে।
অনুভবের স্রোত হয়েছে বেগবতী এখন ভগবৎ চেতন সঞ্চার পথে।
দৃপ্ত জীবন হোক মিলনের মাধুর্যে পূর্ণ জগৎ মাঝে ঈশ্বর ভাবে।
বিশ্বমাঝে দেবতার সাধন যজ্ঞ হোক ব্যাপ্ত জীবন কর্মে হয়ে ভরপুর।

একান্ত বিকাশে ঃ

ন যস্য দ্যাবাপৃথিবী ন ধন্বঃ
ন অন্তরিক্ষঃ ন অদায়ঃ সোম স্থিতম্।
সোমঃ অক্ষাসঃ এব যৎ অস্য মনুঃ।
অধিনিয়মানঃ শৃণাতি বীলু ঋজটি স্থিবর্ণ।। (ঋ. বে. ১০/৮৯/৬)

দেবতার অনুভব স্পর্শ এনেছে জীবন মাঝে রূপান্তর।
নিত্য ভাববিকাশি অনুভবের পর্বে ক্রমশ ব্যাপ্তিতে।
ঐ ভাবপ্রদীপ এসেছে সাধন জীবনে হয়ে বিকশিত।
হও অভিলাষী ঐ ব্রহ্ম ভাবপথের বিপুল বিস্তার প্রবাহে।
দিব্য ভাবমণ্ডলে রয়েছে হয়ে ব্যাপ্ত এসেছে জীবন স্পর্শ
সাধন বিজয়ের এই পর্ব মাঝে এসেছে ভাগবতী স্পন্দন দৃঢ়তায়
দেবতার এই অনন্ত ভাববিকাশ পথ সঞ্চার হবে সূচনা
যে করেছে নিবেদন দেবতায় এখন জগৎ বৈচিত্রে তারই চেতনায়।।

এমনই তীব্র ও দৃঢ় আকর্ষণ জেগেছিল বালক সত্যকামের অন্তরে। ক্রিড়া সঙ্গীদের কাছে সে শুনেছে ঋষিদের কথা। বিশেষ করে ঋষি গৌতমের কথা। সত্যকাম বুঝেছিল জীবনের পূর্ণতা আসে ভাগবতী জ্ঞান সঞ্চারে। ভাগবতী প্রজ্ঞালাভের জন্য চাই প্রস্তুতি, শিক্ষণের মধ্য দিয়ে। সত্যকাম চেয়েছিল এমনই শিক্ষালাভের। ঋষি গৌতমের বিষয়ে যা কিছু সত্যকাম জেনেছিল সবই ঐ প্রজ্ঞা ও ব্রহ্মলাভের জন্য। এমনই হয়ে চলে বালকের অন্তরের অন্তর প্রদেশের মধ্য দিয়ে। ব্রহ্মলাভের পটভূমি প্রস্তুত করবার জন্য যে জীবন প্রকাশ প্রয়োজন সেটি সত্যময় হতে হবে। সত্যকাম এমনই সত্য আকর্ষি হয়ে উঠেছে। আগ্রহ জেগেছে সত্যকামের মধ্যে এমনই সত্যলাভের জন্য।

সঃ হ হরিদ্রুমতং গৌতম এতৎ উবাচ
ব্রহ্মচর্যং ভগবতি বৎস্যামি উপেয়াম ভগবন্তম্ ইতি। (তৈ. উ. ৪/৪/৩)

আধুনিক সমাজের সর্বত্র যে কোনও কাজ, পড়াশুনা, স্বাস্থ্য সেবা অথবা অন্য যে কোনও বিষয়ের মধ্যে যুক্ত হতে গেলে প্রাথমিক পরিচয় প্রদান অত্যন্ত আবশ্যক। সমগ্র ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আধার কার্ড — এই মৌল পরিচয় দেয়। এছাড়া রয়েছে পাসপোর্টকে পরিচয়পত্র হিসাবে নেওয়া হয়। এই পরিচয় পত্রের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির নাম, ঠিকানা, পিতৃপরিচয়, ধর্ম, এমনকি জন্মস্থানও জানানো হয় পরিচয়পত্রের মধ্য দিয়ে। তার নিজস্ব বর্ণনা ছাড়াও বর্তমানের ও ভবিষ্যতের যোগাযোগের জন্য ফোন, ইমেল প্রভৃতি নেওয়া হয়। অর্থাৎ ব্যক্তির অতীত পরিচয় ও বর্তমান পরিচয় নিয়ে নেওয়া হয় ভবিষ্যতের দিকে। ঋষিগণের বেদ বিদ্যা - ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষণের ক্ষেত্রেও পরিচয় নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। ঋষিগণ নাম-গোত্র এ সবের মধ্য দিয়েই পরিচয়কে বরণ করে নিতেন। নাম-গোত্র, পিতৃ পরিচয়ের মধ্য দিয়ে ঋষিগণ ছাত্রদের প্রকৃতভাবে গ্রহণ করতেন।

তং হ উপাচ - কিং গোত্র ঃ নু সৌম্য অসি ইতি।
সঃ হ উপাচ ন অহম এতৎ বেদ ভোঃ যৎ গোত্রঃ অহম অস্মিঃ।
অপৃচ্ছম মাতরম - সা মা প্রতি ব্রবীদ
বহু অহমঃ চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বাম্ অলভে
সা অহম্ এতৎ ন বেদ যৎ গোত্রঃ ত্বম্ অসিঃ
জাবালাঃ তু নাম অহম অস্মি।
সত্যকামঃ নাম ত্বম অসি ইতি।
সঃ অহম অস্মি সত্য কামেঃ জাবালঃ অস্মি ভোঃ ইতি।

শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ও ভগবৎ উপলব্ধি অর্জন। এজন্য শিক্ষার্থীকে হতে হত সমর্পিত। সমিৎপাণি হয়ে নিজেকে শিক্ষার জন্য পরিপূর্ণভাবে নিবেদন করে গুরুর কাছ থেকে। শিক্ষার পাঠ নিতে হত। গুরুর দেওয়া শিক্ষাক্রম ছিল শিরোধার্য। গুরুর দেওয়া শিক্ষার মধ্যে সর্বদাই বিভিন্ন বিভাগ থাকতো। যেমন তত্ত্বশিক্ষার সবদিক মিলে তত্ত্ব ও তার বিশেষত্ব বুঝতে হত। এইসব তত্ত্ব শিক্ষার পরিপূর্ণতার জন্য তত্ত্বের প্রয়োগ মাত্রায় উপযুক্ত প্রয়োগকেই নেওয়া হত তত্ত্ব বিষয়ের অঙ্গীকার হিসাবে। আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে রয়েছে যে বাস্তব প্রয়োগ বা প্রাকটিক্যাল তার উদ্দেশ্য হল তত্ত্ব শিক্ষাকে প্রয়োগের দৃষ্টিতে পরীক্ষা করে দেখা। যদি এই পরীক্ষার দ্বারা তত্ত্ব বিষয় প্রমাণিত না হয়ে ভিন্ন কোনও প্রমাণ চলে আসে তবে তাকে ভাল করে পরীক্ষার মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। এমেন করেই বিভিন্নতায় বিধৃত হয়ে থাকে আধুনিক শিক্ষার ধারা। প্রতিটি পাঠক্রমেই রয়েছে প্রয়োজনীয় গুণাবলী

চরিত্র বিন্যাস ও শৈলী। শিক্ষার্থীকে এসব পুরণ করতে হয়। এছাড়াও শিক্ষার্থীকে আবার গ্রহণ বর্জনের জন্য প্রাথমিক পরীক্ষাও দিতে হয় বর্তমান শিক্ষায়।

ত্বম হ উবাচ ন এতৎ অব্রাহ্মণ বিবক্তুম্ অহতি।
সমিধম সোম্যঃ আহরঃ । উপ ত্বা নেষ্যে।
ন সত্যাৎ অগাঃ ইতি। ত্বম উপনীয় কৃশানাম অবালানাম্
চতুঃ শতাঃ গাঃ নিরাকৃত্য। উবাচ-ইমা সৌম্য অনুসংব্রজেতি ইতি।
সঃ হ বর্ষগণম্ প্রবাস। তাঃ যদা সহস্রং সংপেদুঃ। (তৈ. উ. ৪/৪/৫)

ঋষিদের শিক্ষাদান প্রণালি ছিল ব্যক্তি শিক্ষার্থ গুণগত, চরিত্রগত সামর্থের উপর নির্ভরশীল, কোনও শিক্ষার্থীকে গ্রহণ করবার পূর্বে ঋষিগণ বিচার করে নিতেন যে ঐ শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রাথমিক যোগ্যতা আছে কিনা, আর তার চারিত্রিক গুণসম্পদ কেমন। ঋষি প্রাথমিক বিচারে খুঁজে দেখতেন শিক্ষার্থীর মধ্যে সত্যাকর্ষণ ও সত্য নির্ভরতা কতটা। এছাড়াও ঋষি দেখতেন শিক্ষার্থীর চারিত্রিক প্রবণতা। চরিত্রবল যে শিক্ষার্থীর মধ্যে রয়েছে তার পক্ষে অনেক দুরুহ বিষয়ে প্রবেশ করা সম্ভব। আবার চারিত্রিক শক্তি, সত্যনিষ্ঠ শুধুমাত্র নয়, শিক্ষার্থীকে হতে হত দৃঢ়, মনের প্রাণের শক্তিতে তেজময়। একই সঙ্গে তার মধ্যে প্রতিজ্ঞা-নিষ্ঠা একাগ্রতার সাধন সামর্থ যার ফলে সাধনের জটিল ও আপাত অসম্ভব বিষয়ের মধ্যেও সে প্রবেশ করতে পারে।

ঋষিগণের এই শিক্ষণ প্রণালীর শিক্ষার্থীর প্রস্তুতি ও যোগ্যতা নির্বাচনের দিকগুলি যেমন ছিল কঠোর, তেমনি আবার ছিল কোমল ভাবস্নান। প্রতিটি শিক্ষার্থীই ঋষির কাছে হয়ে উঠতেন তাদের পুত্র-কন্যার সমান। ঋষিপত্নী সকল শিক্ষার্থীর নিজ নিজ মায়ের চেয়েও বেশি করে আপন হয়ে উঠতেন। তাদের এই আপনত্ব কোনও সাজানো বিষয় অথবা ক্ষণিকের বিষয় ছিল না। ঋষিপত্নী মায়ের স্নেহ মমতা ও ভালবাসার নিত্য স্পর্শ দিয়ে ঋষির সকল শিষ্যকুলকে রাখতেন তাজা ও প্রাণ-মন-শরীরে সুস্থ।

দেবশক্তির আহ্বানে ঃ

জঘান বৃত্রং স্বাধীনঃ ত্রিস্তরঃ তস্মাৎ
রুরোজং পরী অধ্যাত্মং সিদ্ধিম।
শিবং বিভেদ নবা নবমিত্র সদা বিচিত্রস্য।
আ গা ইন্দ্র অকৃনতঃ স্বয়াং সি।। (ঋ. বে. ১০/৮৯/৭)

দেবতার শক্তিই এসেছে সাধন পর্বে বিপুল প্রভায়।
ভাগবতী পথে এসেছে এখন দীপ্ত প্রকাশ পর্ব।
এখন হবে ঐ পথের মাঝে ব্রহ্ম সাধনের উন্মেষ।
সত্যপথের সৌম্য পর্বে হয়েছে ভাগবতী উৎসাহ মূর্ত
ঐ বিরাট তিনি মহাব্যোমে হয়ে রয়েছেন সদা ব্যাপৃত।
হৃদয়ের বিপুল বিস্তার এখন জীবনের নিত্য আশ্রয়ের ছন্দে
তোমারই অন্তর মাঝে আনন্দ প্রকাশে এসেছে সাধন বিস্তৃতি।
ভগবানে করে বরণ ভাবমার্গে এসেছে অনুভব জীবন কর্মপথে।

দৈবীকৃপার প্রবাহ ক্ষণে ঃ

তং হ তৎ হৃৎ অনয়া ইন্দ্রঃ ধীরঃ।
অসীন পর্ব বৃজিনা শৃনাসি।
প্র যে মিত্রস্য বরুণস্য ধাম
যুজং ন জনা মিনন্তি মিত্রম্।। (ঋ. বে. ১০/৮৯/৮)

গতিময় করেছ তোমার মহাসৃষ্টির সব পর্ব
যে বিশ্বময় প্রভা এসেছে সাধক প্রাণের গভীরে
দেবতার নমানা রূপ বিগ্রহ হয়েছে যুক্ত বিশ্বময়।
গতিম্মান সৃষ্টির এই পর্বে পর্বে হয়েছে সমন্বিত।
গতির প্রবাহ পথ করেছ বিস্তার অনুভব বিস্তারে।
যে প্রাণের মাঝে এসেছে পরশ হয়েছি ভাবদীপ্ত

নিত্য শক্তির শাশ্বত নিত্য প্রবাহ পর্ব সর্বে উন্মোচিত।
যে চিত্র এসেছে ভাবপটে এখন সেই মহাত্ম সাধন পর্বে।

বাসনার বিসর্জনে ঃ

প্র যে মিত্রং প্রায়মর্নং দুরেবাঃ।
প্র সংগিরঃ প্র বরুণং মিনন্তি।
ন্যু মিত্রেষু বধম ইন্দ্র তুম্রং
বৃষণঃ বৃষানম্ অরুষং শিশীহি।। (ঋ. বে. ১০/৮৯/৯)

সাধন পর্বের গভীরে যদি জেগেছে দৃঢ় প্রত্যয়।
হয়েছে যদি জীবনের মাঝে নিত্য দিনের দৃপ্ত আশ্রয়ে।
এখন বিকাশ পর্বের জীবন স্পন্দন হয়েছে জাগ্রত।
দেবতার এই বিকাশ পর্ব জীবনের জন্য হয়েছে নিত্য প্রবাহী।
এখন হয়েছে বাসনার আগামীর অবয়বের আকর্ষণ।
সাধক প্রাণ যদি করে বিসর্জন ঐ বাসনার সমূল বিনাশ।
ঐ ভাবপ্রবাহের এই নিত্য পথের এখন দৈবী প্রেরণার আশ্রয়ে
দেবরূপ সমুহের সদা বিকাশ তরে তারই এখন স্বতঃ উপস্থিতি।।

বিশ্বমাঝে দৈবীসম্পদ ঃ

ইন্দ্রঃ দিব ইন্দ্রঃ দিশঃ পৃথিব্যাঃ ইন্দ্রঃ।
অপাম ইন্দ্রঃ ইত পর্বতানাম ইন্দ্রঃ।
বৃধাম ইন্দ্রঃ ইনম্ অধিরানাম ইন্দ্রঃ।
ক্ষেমেঃ যোগেঃ হব্য ইন্দ্রঃ।। (ঋ. বে. ১০/৮৯/১০)

দেবতার পরম প্রকাশ এখন সৃষ্টির সব পর্বে।
দেবলোক মনুষ্যলোক মানবেতর লোকে হয়েছে প্রস্তুত নিবেদন।
দেবতার এখন নিত্যদিনের বিকাশের এই প্রভাময় প্রকাশে
মহামাতৃকার মহাশক্তির এখন উদার দান সাধনক্ষেত্রে।
যে সাধন প্রাণ চেয়েছে দেবতার শক্তি হয়েছে কৃপার বর্ষণ সেথায়।
এখন পৃথিবীর সম্পদ হয়েছে ভরপুর উদার উন্মোচনের প্রবাহে।
এই মহামাতৃকার জগৎ প্রপঞ্চ হয়েছে জীবন সম্ভারে পূর্ণ।
আলো বাতাস জল — সব প্রাণের দ্যোতনায় প্রকৃতির এই প্রবাহে হয়ে পূর্ণ।।

ঋষি গৌতমের ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি এমনই ছিল। তাঁর কাছে শিক্ষার জন্য দাবীদার অথবা ইচ্ছুক প্রার্থী ছিল বহু সংখ্যক। তিনি বিশেষভাবে সত্যার্থী শিক্ষার্থীদেরই তাঁর শিক্ষায় গ্রহণ করতেন। উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা ক্রমান্বয়ে সত্যানুসন্ধানী হয়ে বিস্তৃত হয়ে থাকতেন। এদের যেমন ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা ছিল একটি মৌল উদ্দেশ্য তেমনি আবার সকলের সঙ্গেই ছিল সমাজ বিষয়ে সচেতনতা। সকলকেই সমাজের কোনওনা কোন দিকে হতে হত যুক্ত। আত্মবিজ্ঞানের পথে নিজের মোক্ষ বিষয়ে সাধন এবং একই সঙ্গে জগতের হিত সাধনের কর্ম ও উদ্যোগ ছিল ঋষির এই 'স্বাধ্যায়' শিক্ষা ছিল প্রধান মাধ্যম। এখনকার দিনে খাইয়ে দেওয়া বা স্পুন ফিডিং বহু ক্ষেত্রে হয়ে রয়েছে বাস্তবিক শিক্ষাদানের পথ। ঋষিগণের পদ্ধতি ছিল এমন অগ্রবর্তী যে এমনকি বহু অথবা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই ধরনের এগিয়ে থাকা পথ কল্পনায় আনতে পারবে না। সত্যকামের শিক্ষা পথটি অতি আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে আরও অগ্রবর্তী ছিল। ঋষির শিক্ষণ ক্ষেত্রে প্রথম নির্বাচন পদ্ধতি সমাপন হল শিক্ষার্থীর চরিত্র বিচার ও অভ্যাস, রুচির মধ্য দিয়ে নেওয়া হল শিক্ষার্থীকে। সত্যকামের সত্যবচন ঋষি গৌতমকে মুগ্ধ করে দেয়। গৌতমই হলেন সত্যকামের গুরু।

অথ হ এনম ঋষভঃ অভি উবাদ - সত্যকাম। ইতি—
সোম্য সহস্রং স্মঃ প্রাপয় ন আচার্য কূলম্। (ছা. উ. ৪/৫/১)

ঋষি গৌতম সত্যকামকে তাঁর শিক্ষাঙ্গনে গ্রহণ করে নিলেন। গৌতম যখন শিষ্যরূপে সত্যকাম নামক নবীন যুবককে গ্রহণ

করে নিলেন তখন সকলে হয়েছিল বিস্মিত। সকলে আরও বেশি মাত্রায় বিস্মিত হয়ে গেল সত্যকামকে ঋষি গৌতম যে কাজ দিলেন শিক্ষার অঙ্গ রূপে। সত্যকামকে তিনি দিলেন শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষা কর্ম। ঋষি গৌতম সত্যকামের জন্য বরাদ্দ করে দিলেন চার শত গাভী। এইসব গাভী বেশিরভাগই রুগ্ন, বৃদ্ধ, নানা সমস্যায় জর্জরিত। গুরু আদেশ করলেন এইসব গাভীদের নিয়ে বনে প্রবেশ করতে। আর যখন এইসব গাভী সুস্থ হয়ে উঠবে আর দুগ্ধবতী হবে, সব মিলিয়ে সংখ্যা হাজার হয়ে উঠবে, তখনই ফিরে আসতে, আগে নয়। অনেক পাশ্চাত্যের পণ্ডিত গৌতমের এইসব শর্ত ও শিক্ষণের জন্য কাজ দেখে তাঁকে 'মোস্ট ক্রুয়েল টিচার'— বলে বর্ণনা করেছেন।

ব্রহ্মণঃ চ তে পাদং ব্রবানী ইতি।
ব্রবীতু মে ভগবন্ ইতি। তস্মৈ হ উপাচ
প্রাচী দিক কলা প্রতীচী দিক কলা দক্ষিণা দিক কলা উদীচী দিক কলা
এষঃ বি সৌম্য চতুষ্কলঃ পাদঃ ব্রহ্মণঃ প্রকাশবান নামঃ। (ছা. উ. ৪/৫/২)

সত্যকাম তার গুরুর দেওয়া কাজ আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে নিলেন। গুরুর দেওয়া কাজ কতটা কঠিন সে সব বিচার তিনি করেননি। সত্যকামের স্বপ্ন ছিল ঋষি গৌতমের কাছে শিক্ষালাভের সুযোগ পাওয়া। এই সুযোগ পেয়ে তিনি খুশিতে ভরপুর হয়ে গেলেন এজন্য যে গৌতম তার শিক্ষক হয়ে শিষ্যরূপে তাকে বরণ করে নিয়েছেন। এছাড়াও দুর্বল - রুগ্ন গাভীদের নিয়ে বনের মধ্যে প্রবেশ করার ফলে যেসব সমস্যা তার মধ্যেই প্রধান হল প্রাণের বিপদ। বনের হিংস্র পশুরা যে কোনও সময়ে ঐ গাভীদের এবং তার সঙ্গে নবীন যুবক সত্যকামের প্রাণ ওরা মূহুর্তে কেড়ে নিতে পারত। এসব বিষয়ে সত্যকাম কোনও ভ্রূক্ষেপ করেনি। তার মধ্যেই রয়েছে নিহিত সত্যকামের নিজস্ব বিশ্বাসের পরীক্ষা। বিশ্বাস রয়েছে কিনা তার মৌল ভিত্তি হল সত্যকামের অভ্যন্তরে যে অভিব্যক্তি হয়েছিল তৈরী তারই ভিত্তিতে। গৌতমের কাছ থেকে শিক্ষণ কাজ পাওয়াতেই সত্যকাম হয়ে উঠলেন আনন্দে ভরপুর। তার আনন্দ বিশ্বাস ও ভক্তির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে।

অগ্নিঃ তে পাদম্ বক্তা ইতি। সঃ হ স্বঃ ভুতে গাঃ অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চকারঃ
তাঃ যত্র অভিসারম বভুবঃ তত্র অগ্নিম উপসমাধায়ঃ।
গাঃ উপরুধ্যঃ সমিধম আধায়। পশ্চাৎ অগ্নেঃ প্রাঙ্ উপ উপবিবেক। (ছা. উ. ৪/৬/১)

সত্যকাম মহানন্দে ঐ অসম্ভব দায়িত্বের কাজে নেমে পড়লেন। সহায় ছিল দৃঢ় বিশ্বাস ভগবানে; পরিপূর্ণ গুরুনিষ্ঠা আর সত্যময় চরিত্রবল। গুরুনিষ্ঠায় বিন্দুমাত্র দ্বিধা, প্রশ্ন, ক্ষণিকের অন্ধকার ভাব-এর কোনওটিই সত্য কামের চেতনাকে স্পর্শ করতে পারেনি। দৃপ্ত চেতন সত্যকাম মহানিষ্ঠার সঙ্গে মহানন্দেই ছিলেন ঐ সব গাভীদের নিয়ে। বনের পটভূমিতে সাধন ভজন সবটাই প্রকৃতির সঙ্গে মিশে থাকে। দিনের বেলায় সূর্যদেবকে তার আলোর মালায় প্রত্যক্ষ করা আর রাতের বেলায় আকাশের তারা আর তিথির শীর্ষে চন্দ্রমার সুষমও স্নিগ্ধ আলো মনের দীপ্তি দিয়ে নক্ষত্র তারা মনের মাঝে অর্গল উন্মোচন করে নিয়ে এসেছে অন্ধকারকে সরিয় জীবনসমূহ এগিয়ে চলবে অনন্তের উপলব্ধির মধ্য দিয়। সত্যকামের সাধন এগিয়েছে আগামীর অভিমুখে। এছাড়াও মানবের পথচলা এখন ফুটে উঠবে প্রাবল্যে।

যা কিছু এই মহাশক্তির স্বীয় ব্যবস্থায় প্রকৃতির সব উপাদান হয়েছে জগতের মাঝে সুষম সম্পর্ক বজায় রেখেছে মহাবিশ্বে সবই এক অনন্যতায় নিভৃত হয়ে রয়েছে। প্রাপ্তি হয়েছে অন্যান্য উপাদানের মত সত্যকামের নিশ্চিত সাধন পথ এখন সাধন পর্বে ক্রমে অনন্যতায় বিধৃত বিশ্ব দেবতার ক্রোড়ে উপস্থিত সাধক সত্যকাম।

বিরাটের মহিমা মানব চেতন উন্মেশে ঃ

প্রাক্তভ্যঃ ইন্দ্রঃ প্র বুধো অং হভ্যঃ
প্রান্ত রিক্ষাৎ প্র সমুর্দ্রস্য ধাসেঃ।
প্র বাতস্যঃ প্রথমঃ প্র জমে অন্তাৎ।
প্র সিতুভ্যৌ রিরিভ্যঃ প্র ক্ষিতিভ্যঃ। (ঋ. বে. ১০/৮৯/১১)

বিশ্বমাঝে রয়েছে জীবন সূত্র হয়ে ব্যাপ্ত সর্বত্র সৃজনে।
ঈশ্বর ভাবনায় হয়ে ভরপুর যে প্রাণপ্রদীপ সদাভাস্বর জ্যোতির্ময়।
হয়েছে তারই ভাববিস্তার জগৎ মাঝে নিভৃত একান্তে।
দেবতার বিস্তার হয়েছে ভাবপথের বিশ্বাসের পরম সূত্র।

দেবতার দান এখন বিস্তৃত সৃষ্টির পরতে পরতে হয়ে নিহিত
মহাসমুদ্রের অতল গভীরে দিয়েছেন তিনি নবীন সৃষ্টির সম্ভারে।
দিয়েছেন তিনি আকাশের ব্যাপ্তি জীবনের অবারিত প্রসারে।
অনন্ত প্রসারী অসীম আলোক প্রকাশের এখন নবীন রূপসম্ভার।

অসীমের জীবন বিকাশ ঃ প্র শোশুচত্যা উষসৌ ন কেতুঃ।
অসিন্বা তে বর্তনাম্ ইন্দ্র হেতিঃ।
অশ্মেব বিধ্য দিব আ সৃজানঃ।
তাপষ্টেন হেষসা দ্রৌঘ মিত্রান্।। (ঋ. বে. ১০/৮৯/১২)

দেবতার দেওয়া এই জীবন ব্রত হোক মূর্ত জগৎ পথে।
এখন হোক এই অন্তর মাঝে ফুটে ওঠা আলোর বিস্তার জগতে।
হয়েছে জীবন মাঝে ভাগবতী ভাব সঞ্চার স্বতঃ বিকাশ পর্বে।
ঐ অনন্ত বিস্তার পর্বে আসুক এই দেব বিকাশের পর্বে পর্বে।
দেবতার শাসন হোক মূর্ত জীবনের পথ চলার নিত্য প্রয়াসে।
আলোর বিকাশ হোক জীবনের ভাবে কর্মে চিন্তার প্রয়াসে।
অনন্ত আলোক উৎস হোক উন্মোচন এই জীবন পথের উত্তরণে।
এখনই আসুক ঐ অনন্ত ভাববিকাশের একান্ত প্রবাহ জগতের সব জীবন মাঝে।।

সত্যকামের প্রাক-যুবক বয়স থেকেই এই সাধন যাত্রা শুরু। বনের গভীরে সত্যকাম শত্রুর পরিবর্তে সব বন্ধু পেয়ে গেলেন। এই বন্ধুর অবারিত আবেদন আসে বনের সব হিংস্র পশুদের কাছ থেকেই। এরা কেউই নিরীহ নয়। হিংস্র জন্তুগণ তাদের সাধারণ স্বভাব মতই নিরীহ মানুষ — গরু সকলকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করে ঐ জীবনগুলোর জীবনের শেষ করিয়ে দেয়। সত্যকামের ক্ষেত্রে এইসব স্বাভাবিক শত্রুরা সব বন্ধুতে পরিণত হল। এরা একই ঐ অনন্ত সত্যের সত্য প্রকাশরূপ চরিত্র সত্যকামের কাছে মাথা নুইয়ে যায়। এরা কেউই না যুবক সাধক, না তার সঙ্গী গরুর দলের কাউকে ক্ষতি করে। সাধনার পর্বে পর্বে সত্যকাম প্রকৃতির কাছ থেকে জ্ঞানবার্তা পেতে শুরু করেন। ঐ মহাকাশ থেকে এসেছে বার্তা। বাতাসের প্রবহমানতায় এসেছে বার্তা মহাজাগতিক উৎস থেকে আলোর মালা এসেছে যেন বিদ্যুতের ঝলকের মত বার্তা আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বনের পশুদের কাছ থেকে এসেছে বার্তা। সব বার্তাই ব্রহ্মবার্তা। চার দিক থেকে চার ধরনের প্রকাশ বার্তা সত্যকামের মনপ্রাণ হৃদয় ভরিয়ে দেয় অনন্য ভাগবতী প্রজ্ঞায়, উপলব্ধিতে ভালবাসা-ভক্তিতে আবার নিষ্পৃহতায় জগৎ ব্যাপারে নিরাশক্তিতে। যে প্রাণ মন হৃদয় দিয়ে সত্যকাম ভগবানকে বরণ করে দিয়ে চলছিল এগিয়ে, তারই আগামীপর্ব স্থির হয়ে গেল অনন্য অখণ্ডতায়। ব্রহ্মজ্ঞান বিকাশ সত্যকামের অন্তর মাঝে স্বতঃই মূর্ত হয়ে জীবনের সব বিস্তারের দিকগুলিই একই বিন্দুতে সংহত হয়ে এক পরম ঘনীভূত ভাগবতী উপলব্ধির সঞ্চার করে দেয়। এখন সত্যকাম স্বয়ং ভগবৎ প্রেম-বিজ্ঞানময়; ঐ ব্রহ্মচেতনে সমাহিত। তারই এখন অনন্য ক্ষণ জীবনের এই পথচলায়, জীবনের এই এগিয়ে চলার মধ্যে ভগবান স্বয়ং নিহিত হয়ে রয়েছেন। সত্যকাম লাভ করলেন চতুষ্কল ব্রহ্মের উপলব্ধি। চতুষ্কল ব্রহ্ম পরিচয় হল; প্রকাশবান্ ব্রহ্মং অনন্তবান ব্রহ্ম; জ্যোতিষ্মান্ ব্রহ্ম; আয়তনবান ব্রহ্ম। এই চতুষ্কল ব্রহ্ম পরিচয়ের মধ্যে রয়েছে ব্রহ্মের সমগ্রতার পরিচয়, বেদদৃষ্টিতে। এটি যথাক্রমে চারটি বেদের চারটি সাধন ধারার অন্তিম উপলব্ধি। ঋগ্বেদের উপলব্ধি হল প্রকাশবান ব্রহ্ম-প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম; ব্রহ্ম স্বয়ং সবদিকে, সর্বত্র ব্যাপ্ত। সামবেদের অনন্তবান ব্রহ্ম তৎ ত্বম্ অসি, অনন্ত তিনি আবার সৃষ্টির মধ্যে ভক্তির গাঢ়তায় অবয়বের প্রকাশে হন নিহিত। যজুঃর্বেদে জ্যোতিষ্মান ব্রহ্ম - অহং ব্রহ্মীস্মি— আলোর শরীর হয়ে জীবের সঙ্গে তিনি অভিন্নতায় বিধৃত হলেন। অথর্ববেদে — আয়তনবান ব্রহ্ম — অয়মাত্মাব্রহ্ম তিনিই হয়েছেন এই সমগ্র সৃষ্টি। সত্যকামের চতুষ্কল ব্রহ্মবিদ্যা সৃষ্টির সর্বত্র ভবত্রানের আকর হিসাবে গড়ে ওঠা ভাবতী প্রকাশকে চিহ্নিত করেছে প্রকাশবান-অনন্তবান–জ্যোতিষ্মান-আয়তন বান ব্রহ্ম পরিচয়ের মধ্য দিয়ে। অনন্ত সত্য এখন সাধন চিত্তের অনুভবে মূর্ত প্রকাশিত।।

—ঃঃ—

আমার মা

ভক্তি প্রসাদ

সেদিন সন্ধ্যায় কোন্নগর শকুন্তলা কালী মন্দিরের সামনে তিল ধারণের স্থান নেই। ভক্ত সমাগমে মন্দির চত্বর ভরপুর। মা আসছেন, ভক্তরা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষমান। ঢাক বাজছে। ব্যান্ড পার্টি বাজছে। ঐ তো অনেক দূর থেকে মা এর মাথার মুকুট চোখে পড়ল। মহিলারা উলু ধ্বনি করছে। আলোর রোশনাই চারিদিক ভরিয়ে তুলেছে। অনেক ভক্ত হাতে ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মা এর উদ্দেশ্যে নিবেদন করবে এই মানসিকতায়। "জয় মা" ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত। আজ এই মা এর বাৎসরিক পুজো। আজ মা এর স্বল্প সময়ের জন্য এই কোন্নগর কালিমন্দিরে আগমন। মা আবার ভোর হওয়ার আগেই ফিরে যাবেন। গঙ্গার মা এর বিসর্জন হয়ে যাবে আগামীকাল ভোরের আগেই। হাতে মাত্র কয়েক ঘণ্টা। তাতে কি? এই সময়টুকুর মধ্যেই মা কে পাওয়া। যার যত আবদার, অভাব অভিযোগ সব মাকে জানাতে হবে। শুধুই কি অভাব অভিযোগ মাকে জানাতে হবে? মা এত দূর থেকে আসছেন। মা এর জন্য একটা ভালো বসার আসন চাই। তারপর এই ভীষণ গরম-এর সময়ে পাখার সুষ্ঠ বন্দোবস্ত করা দরকার। মার জন্য ভালো শীতল পানীয়ের ব্যবস্থা করা দরকার। মার তো ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে। গলা শুকিয়ে গেছে। তাই একটু শীতল পানীয়, যেমন দই এর শরবৎ, মালের রস, জল ইত্যাদির ব্যবস্থ চাই। মা এসেছেন মাকে ভালো প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধী ফুলের মালা, স্বর্ণালঙ্কার— এসবে ভূষিত করা চাই।

মা এসেছেন। ওনার ক্ষুধা নিবারণে ফল, মিষ্টি, লুচি, তরকারী— এসবের ঢালাও বন্দোবস্ত। মা পছন্দ করবেন যে তিনি কখন কি কি খাবেন। অন্নভোগের ও ব্যবস্থা আছে। সব সময় মতো মাকে পরিবেশন করা হবে। ভক্তমন ভাবছে আমার মিষ্টিটা মা কি একটু গ্রহণ করবেন না? আমি নিয়ে আসলাম। অনেক কষ্টে হয়তো একটিমাত্র সন্দেশ আমি নিয়ে আসতে পেরেছি। এটা কি মা একটু গ্রহণ করবেন না? ভক্ত মনের অশ্রুসজল এই আকুতি মা এর মন স্পর্শ করে মা আশ্বাস দেন। তাতেই ভক্ত মন ধন্য হয়ে ওঠে। মা কি ভক্তকে দেখতে পাচ্ছেন? নিশ্চয় দেখছেন। মা তাঁর সন্তানকে দেখবেন না এটা হয় না কি? মা তো দেখবেনই। তিনিই দেখছেন। আর তাই জগৎ সংসার চলছে।

আবার এক বছর পর মা আসবেন। তাই ভক্তমন আকুল হয়ে প্রার্থনা করে সে যেন ভালো থাকে। এই পৃথিবীতে কত কষ্ট, কত জটিলতা, কত অশান্তি— এসব থেকে মুক্তি দেওয়ার দায় তো মা এর নেই। কর্মফল তো সন্তানকে ভোগ করতে হবে, —কিন্তু অবুঝ সন্তান তো তা মানতে নারাজ। সে চায় তার কষ্ট মা নিমেষে শোষণ করে নেবেন। কিন্তু সে ভুলে যায় যে এটা পৃথিবী। এটা স্বর্গ নয়। এখানে লোভ, লালসা, অভাব, অভিযোগ। কষ্ট, দৈন্য, লাঞ্ছনা— সবই থাকবে এরই মধ্যে। থাকবে সততা, অপরের জন্য মঙ্গল চিন্তা, আনন্দ, সম্মান, নীতিবোধ, অধ্যবসায়। এটা সবকিছু নিয়েই তো এই পার্থিব জগৎ—এই জগৎ সংসারে এসে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার শক্তিই তো মা দেন। অসম্ভবকে সম্ভব করার প্রচেষ্টা ভক্ত লাভ করে মা এর-কৃপায়। সবসময় মা এর শ্রীপদে ভক্তি পুষ্প অর্পণে ভক্তমন হয়ে ওঠে আনন্দিত, পবিত্র। মা ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই। মাকে ভক্ত ডাকবে বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে নয়; বিপদ এর সাথে লড়াই চালানোর শক্তি লাভ করতে ও উদ্বিগ্ন মনকে শান্ত করতে আর সারাদিন মা এর মহামন্ত্র জপ করতে।

—ঃঃ-

খুঁজে ফিরি ভগবানকেই

সায়ক ঘোষাল

ভগবান হয়ে রয়েছেন ব্যপ্ত অন্তর রাজ্যে চেতন স্বত্তা হয়ে। যারই মন এই চেতনার দিকে দৃষ্টিপাত করার তারই জেগে উঠবে উপলব্ধি। উপলব্ধির ছোঁয়ায় মন হয়ে উঠবে ভাগবতী। এই মন চাইলেই পাবে তার শিখরে উঠে যেতে। ভগবান যে মনে যে হৃদয়ে চেতন স্বত্তা হয়ে বিরাজমান করে সেই মনের কাছে যে কোনো কিছু খুবই সহজ সেই মন তা ভাববে নিজেকে সেইটি হবে। নিজেকে যদি বলবান কর্মোদ্যোগী মানে তাহলে যে বলবান নিজেকে যদি দুর্বল মনে করে তাহলে সে দুর্বল হয়ে যায়। তাই যে ভক্ত

তার কাছে আশীর্বাদ মাকে ইচ্ছার। তাই ভগবানের পথে চলা ব্যক্তি যদি জগতের বাহ্য দিককে বেশি মনোযোগ দেয় তাহলে জগতের এই বাহ্য দিকগুলো মনকে গ্রাস করে নেয় কিন্তু ভক্ত যদি সব কিছু উপেক্ষা করে কর্ম এবং ভক্তির দিকে মনোযোগ দেয় এবং এই বাহ্য দিকগুলোকে জীবনের এক একটি অভিজ্ঞতা হিসেবে নিয়ে প্রভাবিত না হয়ে উপেক্ষা করে ভগবানের দিকে মনোযোগ দেয় তাহলে ভক্তের কাছে শুধুই ভগবৎ আনন্দের ডালি পরে থাকবে যা ভক্ত উপলব্ধিতে নিত্য ভাবে ভগবানের ব্যক্তিকে একটি নতুন নতুন ভাবে অন্বেষণ করতে পারবে। জীবনের মূল উদ্দেশ্য হল সত্যের অন্বেষণ করা। জীবনের প্রতিটি পর্ব এক একটি শিক্ষা নিয়ে আসবে কিন্তু এই একটি পর্ব নিয়ে যদি মন প্রভাবিত না হয়ে শুধু শিক্ষাটি নিয়ে এগিয়ে চলে তাহলে জীবন খুবই সুন্দর হয়ে উঠবে। এই জীবনই শুধু উৎসর্গীকৃতভাবে সত্যের অন্বেষণে সফল হবে। কারণ এই জীবন ভগবানের দেওয়া আশীর্বাদ সেই ইচ্ছা শক্তিকে উপযোগী করে এগিয়ে চলেছে ভগবৎভাবে বেড়ে ওঠার দিকে। কর্মের মাঝে তাঁকে খুঁজে পেতে হবে উপলব্ধিতে, তাঁকে খুঁজে পেয়েছে যে মন তাঁরই চেতন দ্বার খুলে দিয়েছেন তিনি। তিনি হয়ে রয়েছেন নিজস্ব শক্তি অন্তর মাঝে। সেই শক্তি চেতনকেই জাগ্রত করতে হবে জীবন মাঝে। এই শক্তি চেতনই মহাকালের ছন্দে যুগের পর যুগ ধরে জীবের অন্তর মাঝে নন্দিত হয়ে চলেছে। তাঁকে জাগিয়ে তোলার আহ্বান স্বয়ং জীবেরই কর্ম। এই মানব মনের সেই কর্মই উদ্দেশ্য হয়ে চলবে সময়কাল ব্যাপী। মহাকালের কালের ছন্দই হয়ে পরিণত হয়ে তৈরি হয়েছে সংবেদ-ভক্তির সংবেদ। ভক্তির তনু তখন হয়ে উঠবে সেই সংবেদ পরিপূর্ণ যখন সে সম্পূর্ণ মনে আহ্বান করবে পরমব্রহ্মকে। এখন হবে সংবেদের সাহায্যে পরমব্রহ্মের পূর্ণ সত্যের ক্রম বিকাশ অন্তর মাঝে। এই সত্যের বিকাশ ঘটাবে ভাবের বিকাশ। এইভাবেই একের এক ভাবের বিকাশে ক্রমশ এগিয়ে চলবে সাধন পর্ব উপলব্ধির ঢেউয়ে। এই মহাসত্যের মাঝেই হয়েছে এগিয়ে জীবনের ব্যপ্তি। ব্রহ্ম স্পন্দনে হবে ছিন্ন হবে সব বেড়াজাল এই ব্রহ্ম স্পন্দনই ভক্তকে রাখবে ভগবৎ অভীপ্সার স্পর্শে। সাধনা ও ভক্তি হল বিচার বিবেচনা অতিক্রমি। সাধনায় মগ্ন মনের অন্য কোনো কিছু ভাবনা চিন্তার দিকে মন যাবে না কারণ ভক্তিতে আনন্দে ভরপুর মন সদা সর্বদা ভগবানের কথাই ভাববে। এই সাধন যোগ্য ভরপুর মন হয়ে ওঠে এক বিশাল বটবৃক্ষ যার আকর বিশ্বাসে ভরপুর। বিশ্বাস সাধনের স্তম্ভ। বিশ্বাসই সব কিছু উপদান জুগিয়ে দেয় সাধনের যোগ্য। এই সাধন যোগ্য ভরপুর মনই ভগবানের সর্বদা প্রিয়। এই সাধন যোগ্য জীবনের সবকিছু ভস্ব হয়ে যায় না কিছু ছিল ভক্তের জন্যে বাধার আকর। তাই নিয়ত সাধন যোগ্যে ভরপুর মন কখনোই টলে যায় না। ভাগবতীভাব সঞ্চার হয়েছে যে জীবনে যে মনে তার পক্ষেই সম্ভব দিব্যপথ অভিমুখে এগিয়ে চলা। ভগবানকে যে বরণ করে নিয়েছেন জীবন তারই হয় সম্ভবনা ভগবৎ পথে এগিয়ে চলবার। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভগবানকে সন্ধান করে নিতে হবে। কর্মক্ষেত্রে তাকে বরণ করে নিতে হবে। স্বতঃই সে খুঁজে পাবে ভগবানকে নানারূপে নানাভাবে। এরকমভাবেই চেতনার জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই মানবিক ভাব বৈচিত্র চরিত্রের রূপান্তর ঘটে যায়। অন্তরে যখনই তৈরি হয় ভাগবতী আকর্ষণ তখনই চরিত্রের হয়ে যায় রূপান্তর। তখন ভাগবতী অভীপ্সাই জীবনের প্রত্যয় রূপে গড়ে ওঠে। এই প্রত্যয়ের ওপর নির্ভর করেই গড়ে ওঠে অচঞ্চল স্থির চেতন স্বত্তা। এই জীবনের প্রত্যয় হোক শুধু একমাত্র ভাবে ঈশ্বর চিন্তা। জীবনের প্রত্যয় হোক স্থিত চেতনে ভগবানের আহ্বান। এই ভাবেই ভক্তমন অভীপ্সার সাথে ভগবানের ভাবে নিজের সাধনযোগ্যকে করে তুলবে স্থিত জীবন পথে।

—ঃঃ—

ভগিনী নিবেদিতার বিপ্লবী চেতন

পার্থ সারথি বোস

স্বামীজীর সাথে এক সাক্ষাতকারের বিবরণ দিতে গিয়ে মহাবিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন,—

স্বামীজী আমাদের সম্মুখে আলোর উজ্জ্বল চিত্র তুলে ধরেছিলেন। তিনি বললেন ঃ "ভারতের অতীত ছিল গৌরবোজ্জ্বল, ভারতের ভবিষ্যৎ হবে উজ্জ্বলতর। তা না হলে প্রকৃতির ঈশ্বর অর্থহীন হয়ে পড়বেন। রজোগুণের আধিক্য আনতে পারলেই তা ভারতের জীবনে অমৃতের মত কাজ করবে। তাই এখন সবচেয়ে আগে প্রয়োজন হলো সচেতনভাবে রজোগুণ বৃদ্ধির চেষ্টা করে, জীবনকে গতিময় করা। আত্মো-আলোড়নকারি হরণকে তৃণজ্ঞানকারী অভীঃ মন্ত্র নির্ভয়ের যন্ত্র— বহুগুণ সঞ্চিত দাস মনোভাব;

কুসংস্কার ও হীনম্নতাকে ঝেড়ে ফেলবে। ঐহিক ক্ষেত্রে উন্নত পৃথিবীর অন্যান্য জাতির পাশাপাশি সাহসের সঙ্গে চলতে হলে, হে বাঙলার তরুণদল, ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ যাঁর বীরত্বের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন তোমরা তাঁর শৌর্যময় কার্য উদ্বুদ্ধ হও। অন্যান্য জাতির গুণাবলী আয়ত্ত কর, তাদের কারিগরি নৈপুণ্য ও চারিত্রিক উৎকর্ষ অর্জন কর। তারপর শৃঙ্খলার আধুনিক মান উন্নত করে এবং দক্ষতা অর্জন করে তার সাহায্যে তোমাদের দেশে অনধিকার প্রবেশকারী বিদেশীদের অন্যায়ের সমুচিত জবাব তাদের দেওয়া অস্ত্রেই দাও। সাহসের সঙ্গে তাদের নাগপাশ থেকে প্রাচ্য সংস্কৃতির পীঠস্থান ভারতবর্ষকে মুক্ত কর, কিন্তু নিশ্চিত জেনো নিছক পরানুকরণে কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হবে না, তাতে প্রকৃত জীবনের পটভূমি থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। যীশুর মত আমি ধ্বংস করতে আসিনি, এসেছি পূর্ণ করতে। অন্ধ অনুকরণ দাসত্বের নামান্তর। অন্যদেশ এবং সংস্কৃতির যা কিছু শ্রেষ্ঠ ও গ্রহণযোগ্য তা বিচার করে নিতে হবে। কিন্তু একথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই যে, ভারতের সংস্কৃতিই পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই পৃথিবীর সর্বত্র তার বাণী প্রচার করবার একটি "মিশন" আছে ভারতের।

স্বামী বিবেকানন্দের সাথে ভাবীকালের এক মহাবিপ্লবীর সাক্ষাৎকারের বিবরণ পড়লে আর কোন সন্দেহ থাকে নি। স্বামীজী চেয়েছিলেন ভারতবর্ষে জেগে উঠুক "অভীমন্ত্রে", মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রে। দীক্ষিত হয়ে যুবশক্তি দেশকে স্বাধীন করুক, ঝাঁসির রাণী যেভাবে অস্ত্র হাতে ইংরেজশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, ভারতবাসী যিনি চাইতেন ভারতবর্ষের মানুষ বীর্যবান হোক, বীরের মত সংগ্রাম করে শুধুমাত্র ভারতের পুরুষেরা নয় ভারতীয় নারীও জীবন উৎসর্গ করুক স্বাধীনতা যুদ্ধের কায়দা ঝাঁসীর রাণীর মত। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করুক রক্তপাতের মধ্যে দিয়ে স্বামীজীর এই ইচ্ছা প্রমাণিত সত্য। তিনি চাইতেন রজোগুণের "double dose" তিনি নিজে এবং নিবেদিতার মাধ্যমে ভারতীয় বিপ্লববাদের সমর্থনে কাজ করে নিয়েছেন। স্বামীজীর সম্মতিতেই ভগিনী নিবেদিতা বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছ থেকে এই সত্যই উপলব্ধি করেছিলেন যে ঈশ্বরের প্রিয় ভারতবর্ষ দীর্ঘ পরাধীনতার দুঃখ এবং দৈন্যে ধ্বংসের মুখোমুখি। ভগবানকে নিজ বাসভূমিতে ফিরিয়ে আনতে হলে চাই উন্নততর অসীম শক্তিমান নির্ভীক স্বাধীনচেতা জাতির অভ্যুদয়। চাই পুরুষের সাথে সাথে নারী জাগরণ। ভগিনী নিবেদিতা যে তাঁর স্বপ্ন এবং সাধনার যোগ্য উত্তরসাধীকা তিনি সে বিষয়ে ছিলেন নিশ্চিন্ত, স্বামীজী যোগের চরম ভূমিতে আরোহণ করেও যে ভারতবর্ষের সমকালীন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সমন্ধে মহান দৃষ্টি রেখে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করে গেছেন প্রখ্যাত লেখক গবেষক স্বামীজী নেতাজীর একান্ত অনুরাগী শ্রী শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর গবেষণামূলক বিখ্যাত গ্রন্থ "নিবেদিতা লোকমাতা"য় যে প্রামাণিক তথ্য দিয়েছেন তা উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে স্বামীজীর বিপ্লবীর দৃষ্টিভঙ্গী। শঙ্করীবাবু লিখেছেন, ... লিজেল রেঁমই নিবেদিতার রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে নানা চাঞ্চল্যকর প্রকাশ করেন। কিন্তু যেহেতু সেগুলির উপযুক্ত তথ্যসূত্র জানাননি এবং নিবেদিতার চিঠিগুলি তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহেই থেকে গিয়েছিল তাঁকে অনেকে চ্যালেঞ্জ করেছেন এবং তিনি বাঙালী বা ভারতবাসী নন। এমনকি ইংরজেও নন। তাই প্রতিবাদগুলির সমস্ত অংশ সম্বন্ধে অবহিত থাকতে পারেননি। যেটুকু জেনেছিলেন তাদের সম্বন্ধে উত্তর দেবার আগ্রহও বোধ করেননি, কারণ নিবেদিতা-গবেষণা শেষ করে তিনি অন্যতর চিন্তা-পর্বে প্রবেশ করেছিলেন। তবে তাঁর সংগ্রহের নিবেদিতা পত্রগুলি ও অন্যান্য তথ্য বর্তমান লেখককে (শঙ্করীপ্রসাদ বসু) দেবার কালে, জিজ্ঞাসিত হয়ে, ঐ সব সমালোচনার কিছু কিছু উত্তর ব্যক্তিগত পত্রে দিয়েছিলেন,

লিজেম রেঁম এই সূত্রে বিভিন্ন সময়ে আমাকে (শঙ্করীপ্রসাদ বসুকে) যে সব চিঠি লেখেন, তাদের থেকে কিছু প্রাসঙ্গিক অংশ উপস্থিত করছি। পত্রগুলির বক্তব্য অবির্তকে গৃহীত হবে এমন মনে করি না। তবে যিনি নিবেদিতার জীবনীর উপর ব্যাপক গবেষণা করেছেন এবং নিবেদিতার রাজনৈতিক জীবনের গহন অংশের উপর প্রথম তীব্র অনেকসঙ্গত করেছেন তার অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনা উচিত। লিজেল রেঁম লিখেছেন ঃ "আমি ১৯৩৪ সালে স্বামী যতীশ্বরানন্দের মধ্যবর্তিতায় মিস ম্যাকলাউডের পরিচিত হই, স্বামী যতীশ্বরানন্দ শুনেছিলেন— জ্যা এবরঁ এবং আমি স্বামী বিবেকানন্দের চারটি যোগগ্রন্থ ফরাসিতে অনুবাদ করতে পারি, স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত মিস ম্যাকলাউড কয়েকবার জেনিভায় ক্রমে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। আমরা প্রথমে জ্ঞানযোগের অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন।

মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, আমরা স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যাবলীর বিষয়ে অনেক কাহিনী শুনেছিলাম,

মিস ম্যাকলাউড নিবেদিতার সম্বন্ধে খুবই উচ্চভাষায় কথা বলতেন, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সন্ন্যাস জীবনের জন্য যে কাজ করতে পারেননি, ভারতবর্ষে সেই কাজ সম্পাদনের জন্য নিবেদিতাকে তিনি নির্বাচন করেছিলেন। নিবেদিতা আইরিশ, বিপ্লবী ঐতিহ্য লালিত। বহু বিপ্লবীদের জীবন ও কর্ম তিনি জানতেন। প্রিন্স ১৮৯৪ সাল থেকে ইংলন্ডে নির্বাসিতের জীবনযাপন করছিলেন। নিবেদিতা নিজে গুপ্ত সংস্থার সদস্য ছিলেন। লোকচক্ষুর অন্তরালে গুপ্তসংস্থার কাজ করার দক্ষতার সম্বন্ধে নিবেদিতা অবহিত ছিলেন।

১৯৩১ সালে তিনি মিস ম্যাকলাউডের ইংলন্ডে তাঁর স্ট্রাফোর্ড অন অ্যাভনের বাড়ীতে দেখা করতে গিয়েছিলেন। জ্যা এবরও সঙ্গে ছিলেন। মিস ম্যাকলাউড ডেস্ক থেকে চার ড্রয়ার ভর্তি নিবেদিতার চিঠি আমাদের দেখালেন। তাদের মধ্যে কতকগুলি দারুণ আগ্নেয়-বিপ্লবীদের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের যোগের সংবাদ সেগুলিতে ছিল। মিস ম্যাকলাউড সেগুলিকে, নষ্ট করে ফেলেছিলেন, তিনি বললেন ঃ "নিবেদিতার এই সব কাজ স্বামীজীর নির্দেশে করেছিলেন। ভারতে নিবেদিতার সঙ্গে অন্যান্যদের এই বিষয়কে যোগদানে স্বয়ং স্বামীজীই করে দিয়েছিলেন। তিনি নিবেদিতাকে নিজের রাজনৈতিক কর্ম সমাধা করবার জন্য নির্বাচন করেছিলেন, কারণ জানতেন যে, নিবেদিতা ঐ কাজ করতে সমর্থ। লণ্ডনে যে সব রাস্তাতে নিবেদিতার কর্মক্ষেত্রে ছিল, যে সব জায়গায় স্বামীজী নিবেদিতার সঙ্গে নিয়েছিলেন"

"নিবেদিতা লোকমাতা" পৃঃ ২৮-২৯

উল্লেখিত তথ্যসূত্র প্রমাণ করে স্বামীজী ভারতবর্ষের অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের সাথে একাত্ব ছিলেন এবং রামকৃষ্ণমিশনের ভবিষ্যতের কথা ভেবে নিজে প্রকাশ্যে বিপ্লবী কর্মে যোগ না দিলেও হেমচন্দ্র ঘোষের মত অগ্নিযোদ্ধাদের বিপ্লবী কর্মে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং তাঁর অসমাপ্ত ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ করবার জন্য ভগিনী নিবেদিতাকে রেখে গিয়েছিলেন যা নিবেদিতা গভীর নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন ইতিহাস তার সাক্ষী।

বিপ্লবী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ শুধুমাত্র ভারতবর্ষের মধ্যে জাগরণ ঘটাননি তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে ছিলেন প্রেরণাস্বরূপ, ভারতবর্ষ ক্ষাত্রতেজে বলীয়ান হয়ে এই দেশের জমি থেকে একদিন ইংরেজকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেবে এই স্বপ্ন তিনি দেখতেন। প্যারিস ভ্রমণকালে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফরাসী শিল্পী এমা কালভের ফরাসী জাতীর "লা মার্সেইলাজ—শুনে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। "La Marseillaise" আদতে সমর সঙ্গীত যা গাইতে গাইতে সৈন্যরা কামানের গর্জনের সাথে হুঙ্কার দিয়ে যুদ্ধে যাচ্ছে। এই গান শুনে স্বামীজী এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে বারে বারে এই সঙ্গীতটি তিনি এমা কালভের কাছে শুনতে চাইতেন, এ সম্বন্ধে নিবেদিতার ফরাসী জীবনীকার নিজেল রেঁম তার বিখ্যাত পুস্তক "ভারত কন্যা নিবেদিতা"-য় লিখেছেন, "প্যারিসে মিস ম্যাকলায়ডের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকতেন স্বামীজী, উনি দিশারী। আন্তর্জাতিক ধর্মসভায় কার্যকালপ বোঝবার জন্য স্বামীজী ফ্রেঞ্চ লিখতে শুরু করলেন, পাশ্চাত্য দর্শনের বিভিন্ন প্রস্থানের আলোচনায় তাঁর অনুবাদ, প্যারিস আর ফ্রান্সের উদারতা তাঁর চিত্তকে স্পর্শ করে, অপরা-বিদ্যার কি সমৃদ্ধি এখানে।

কিন্তু এ নিয়ে তাঁর মতামত জানতে চাইলে যেন একটু বিব্রতভাবে উত্তর করেন, "আমার কাছ থেকে কি শুনতে চাও তোমরা? আমার ভাবনা আর ভাষায় রূপ ধারনা, দৃষ্টির মোড় ফিরেছে ভিতর পানে। এখন আছি এক নতুন ভূমিতে।"

মিসেস লেগেটের বাড়ীতে গান-বাজনার সান্ধ্য আসর বসে, কখনো-কখনো বিবেকানন্দ ওখানে যান, এমা কালভে সে-যুগের জগদ্বিখ্যাত ফরাসী শিল্পী। তাঁর গান শুনে স্বামীজী আনন্দ পেতেন। এর আগে আমেরিকার অনেক বক্তৃতা সভাতেই এমাকে দেখেছেন।

এক সন্ধ্যায় বললেন, 'যে ভূমিকায় তুমি সবচেয়ে আনন্দ পাও, সেই ভূমিকায় তোমাকে একবার দেখতে ইচ্ছা করে, কী সে ভূমিকা বলো তো?'

এমার মুখ-চোখ আগুন-রাঙা হয়ে ওঠে। বলেন, 'যখন কারামন সাজি, তখন মনে হয় ঘর-ছাড়া বাঁধন-ছেঁড়া যাযাবর তরুণী আমি। কিছু মনে করাব স্বামীজি, প্রতি সন্ধ্যায় নাচ-গানের আসরে আমার অজানাতে আমি অমনি হয়ে পড়ি।'

'আমি গিয়ে শুনব, 'স্বামীজী বলেন।

বাধা দিয়ে নিবেদিতা বলে ওঠেন, কিন্তু সে অসম্ভব স্বামীজি থিয়েটারে আপনার যাওয়া চলবে না, দারুণ সমালোচনা সইতে হবে তা হলে।'

অবাক হয়ে নিবেদিতার পানে তাকান স্বামীজি। নিরুত্তর একটু হাসি ফুটে উঠে তাঁর মুখে।

দুদিন পরে এক সন্ধ্যায় মিঃ লেনেটির সঙ্গে নাট্যমঞ্চে গেলেন স্বামীজি। বিরতির সময় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল শিল্পীর নেপথ্য-গৃহে। স্বামীজিকে দেখে কোরাস গায়িকা বলাবলি করে, 'ধীর গম্ভীর সৌম্যদর্শন উনি কে? আমাদের এমার ওঁর এত ঔৎসুক্য?'

এমা বিব্রতভাবে ওঁকে অভ্যার্থনা জানান,

'তোমর কারমেন দেখতে এসেছিলোম এসব' স্বামীজি বলেন, তাকে খারাপ ভেবোনা। সেও সত্য, সে তো মিথ্যা বলে না, তার উদ্দামতায় আত্মস্বরূপকেই আনাবৃত করে সে, যে মহীয়সী নরীর প্রার্থনার শেষ ম্যাডোনাকে বলেন, 'যা গো, আমার কথায় কান দিও না তুমি, আমি কামনার আগুনে পুড়ে মরতে চাই যা,' তাঁদেরই জাত সে,'

পরদিন লেগেটির বাড়িতে অনুরোধ করেন, অনুষ্ঠানে শেষে সুরের আগুন জ্বালিয়ে তুললে যে-গানে, আমায় সেটি শোনাবে এসব? ওটি আমি শিখতে চাই।'

'লা মার্সেইয়াজ? কি ও যে সমর-সঙ্গীত স্বামীজি, কামান গর্জে উঠছে, সৈন্যরা হুঙ্কার ছাড়ছে..'

'হ্যাঁ, ওই গানটিই, ও-গানে নির্ভয়ের আগুন জ্বলে তোমাদের অন্তরে, দেশকে ভালোবাসে তার জন্য প্রাণ দেবার প্রেরণা পাও তোমরা, তাই না? কল্পনায় দেখতে পাও, কি ভুল ভেবেই নাগরিকরা কোন অমূল্য শক্তির আহ্বানে মাথা তুলে দাঁড়ান, আমার ছেলেদের এ গান শেখাব।' "ঐ-পৃ-২২৬-২২৭"

উপরে উল্লেখিত উদ্ধৃতি থেকে আমরা জানতে পারি স্বামীজির সাধ্য পরাধীনতার গ্লানি এবং বেদনা কি তাঁর হৃদয়কে আলোড়িত করে বিপ্লবের আগুনে জ্বলে উঠেছিল। তিনি চাইছিলেন ভারতবর্ষের সমুদ্র গর্জনের মত হুঙ্কার দিয়ে এ দেশ থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করুক। তা 'লা মার্সেইয়াজের সমর সঙ্গীত স্বামীজির হৃদয়কে তোলপাড় করে তুলেছিল এবং এমা কালভের কাছে তিনি গানটি লিখে নিয়ে বেলুড় মঠে মাঝে মাঝে গাইতেন।

বহু বৎসর পর এমা কালভে ভারতবর্ষে এসে বেলুর মঠে যান এবং তখন যে সন্ন্যাসীর কণ্ঠে "লা মার্সেইয়াজ" শুনেছেন তাঁরা এমার কাছে এই গানটি গাইবার জন্য অনুরোধ করেন। স্বামীজি যেন দিব্যচক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন আগামী দিনে তাঁর এক মানস-সন্তান মিন্‌মিন্ করে অহিংসার নামাবলি গায়ে দিয়ে আবেদন-নিবেদনের পথে না গিয়ে অস্ত্র হাতে সামরিক শক্তি বলে "কদম কদম বাড়ায় যায়" এর সমর সঙ্গীত গাইতে গাইতে সমরাঙ্গণে হবেন মাতৃভূমির শৃঙ্খল মুক্তির সঙ্কল্প নিয়ে।

স্বামী বিবেকানন্দ একজন যোগীপুরুষ হয়েও ভারতের পরাধীনতা তাঁকে প্রবলভাবে মুক্তি সংগ্রাম উন্মুক্ত করেছিল, তিনি উপলব্ধি করেছেন সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে রক্তপাত হবে তাতে যে স্বাধীনতা আসবে এরফলে ভারতবাসী পরিপূর্ণ ত্যাগের মহিমা উপলব্ধি করতে পারবে, স্বামীজি জানতেন রক্তের বিনিময়ে যা লাভ করা যায় তা চিরস্থায়ী হয় এবং ভবিষ্যৎ কে প্রেরণা দেয়।

লিজেল রেঁম শঙ্করীপ্রসাদ বসুকে লিখেছেন, '১৯৪৮-৪৯ সালে যখন আমি ১৯০২-১৯১১ কাঠের পুরাতন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাগুলি দিনের পর দিন উল্টেছি- তখন সেগুলিতে নিবেদিতার লেখা বহু সম্পাদকীয় দেখেছি। যেগুলি স্বাক্ষরিত নয়—স্টাইল অনুযায়ী সেগুলিকে নিবেদিতার বলে মনে করেছে। নিবেদিতার কালে কর্মরত করেছে। নিবেদিতার কালে কর্মরত বাগবাজারের কিছু প্রাচীন ব্যক্তির সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়েছিল। সে সব দিন দিন বিপদ ও আতঙ্কের, নিবেদিতার বাড়ী থেকে লেখাগুলি ছাপাবার জন্য নিয়ে যাওয়া হত। নিবেদিতা বহু বিষয়ে খবর রাখতেন।

"১৯৩৮ সালে এবরর সঙ্গে বিনয় সরকারের সাক্ষাতে গিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন স্বদেশেযুগে বাড়ীতে সাবান তৈরী হত, আর সেগুলি বিক্রীর জন্য নিবেদিত বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরতেন-উদ্দেশ্য লোকজনের সঙ্গে কথা বলা, ডন সোসাইটিতে নিবেদিতা স্বদেশী বক্তৃতা করেছেন। ছেলেদের সক্রিয় কার্য প্রনোদিত করেছেন।

'১৯৩৮ সালে আমি জেনিভায় বন্দেমাতরম অফিসে নিয়োজিত সেখানে ছদ্মনামা কয়েকজন ভারতীয় সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। নিবেদিত ওখানে গিয়েছিলেন। জেনিভা থেকে তাঁর লেখা একটি চিঠি আছে। ১৯৪০ সালে অফিসটি বন্ধ হয়ে যায়।

"এস. র‍্যাটক্লিফ এক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্র, র‍্যাটক্লিফের মৃত্যুর পর আসি, এক তাড়া চিঠি পাই— নিবেদিতার সেই চিঠিগুলি নূতন। আমার বই শেষ হবার পর সেগুলি পেয়েছি।'

"মিস ম্যাকলাউড স্বামী বিবেকানন্দের কিছু চিঠি দেখিয়ে আমাদের বলেছিলেন, এগুলি একেবারে আগুনে, রাজনৈতিক অস্থিরতার কালে লেখা, স্বামীজি অনেক কিছুই করেছিলেন, চন্দন মধ্য দিয়ে ভারতে অস্ত্রচালান হয়েছে। আমি সেগুলি দেখেই, অস্ত্রসহ একটি ঠিকা ধরা পড়ে, কিন্তু তার সূত্রে কাউকে ধরা যায়নি।

"আমরা মিস ম্যাকলাউডকে ঐ সব চিঠি নষ্ট করতে দেখেছি। তিনি বললেন, ঐ সব অতীত ইতিহাস। সে যাইহোক, একদিন ভারত স্বাধীন হবে— স্বামীজি খুশী হবেন।

"নিবেদিতা লোকমাতা"— শঙ্করী প্রসাদ বসু ২য়খণ্ড পৃঃ- ৩০-৩১

ভগিনী নিবেদিতাকে মাধ্যম স্বাামী বিবেকানন্দ ভরতবর্ষের মাটি গুপ্ত সশস্ত্র সংগ্রামের কার্যকলাপ শুরু করেছিলেন উপরে উল্লেখিত উদ্ধৃতি একথাই এমনি করে এবং স্বামীজি ইহলোক ত্যাগ করবার পরও নিবেদিতা আজীবন এ সংগ্রাম থেকে বিরত থাকি।

চির নমস্য ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবীরা এবং এই সশস্ত্র সংগ্রামের যিনি সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন স্বামীজি এবং নিবেদিতার উত্তর সাধক।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রাণপ্রিয় নরেন্দ্রনাথ পরমপ্রাণের চরমতম শিখরে উঠেও পরাধীনতার দুঃখ এবং দেশের মানুষের মর্মান্তিক অশিক্ষা এবং দারিদ্র তাঁকে স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে উদাসীন থাকতে দেয়নি।

সুভাষচন্দ্রের জীবনে প্রথম পছন্দ ছিল সন্ন্যাস। কিন্তু তিনি রাজনীতির ছদ্মবেশে আধ্যাত্মিক সাধনায় জীবনের কঠিনতম সংগ্রামের মধ্যেও বিরত হননি। ভারতে থাকাকালীন তিনি তীব্র সংঘাত এবং সংগ্রামের মধ্যেও আধ্যাত্মিক সাধনা থেকে বিরত হননি। এখান থেকে চলে যাবার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণাঙ্গনে আজাদ-হিন্দ-ফৌজেও সর্বাধিনায়কগণ মৃত্যুর মুখোমুখি দাড়িয়ে কালনৃত্য উপভোগ করেছিলেন। যাবার উপর শত্রুর বোমারু বিমান, মাটিতে কামন এর রাইফেলের গর্জন-চারিদিকে রক্তের বন্যা তাঁরই মধ্যে মহাযোগী সুভাষচন্দ্র তাঁর মাতৃভূমির শৃঙ্খল মুক্তির জন্য নির্ভীক-অচঞ্চল-অবিচল থেকে মৃত্যুর অট্টহাস্যকে অগ্রাহ্য করে মাতৃভূমির জন্য সংগ্রাম করে নিয়েছেন এবং মৃত্যুর বিভীষিকার মধ্যে তিনি যে তার 'ইষ্ট' মহাকাল কালীকে দর্শন করেছিলেন, প্রায় ৫০ বৎসর পর্বে ১৮৯৮ সালে, স্বামী বিবেকানন্দ মৃত্যুরূপা মহাকালীর প্রত্যক্ষ দর্শনের মাধ্যমে তাঁর উপলব্ধিকে এক অবিস্মরণীয় কবিতায় প্রকাশ করেছিলেন তাঁর ভাবশিষ্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র মৃত্যু উপত্যকার মধ্যে সেই মৃত্যুরূপা কালীকে যেন দর্শন করেছিলেন।

যিনি মৃতুরূপা কালীকে দর্শন করেছেন তাঁর পক্ষেই এই ধরনের উপলব্ধি ভাষায় একাল করা সম্ভব।

স্বামীজি যা লিখলেন তার আংশিক তুলে ধরছি—

লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর! দুঃখকালি জগতে ছড়ায়,
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে; মাতৃরূপা যা আমার আয়!
করালি! করাল তোর নাম, মৃতু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে!
কালি, তুই প্রলয়রূপিনী, আয় যা গো আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুর যে বাঁধে বাহু পাশে,
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তাঁরি কাছে আয়।

স্বামী বিবেকানন্দ যে দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সংগ্রামী জীবনে মহাকালীর যে ভয়ংকর দর্শন করে পরম উপলব্ধি লাভ করেছেন তেমনি নেতাজী সুভাষচন্দ্রও মহাযুদ্ধের বিধ্বংসী তাণ্ডব মৃত্যু এবং ধ্বংসের সঙ্গে আজীবন যে শাক্তের পূজারী মহাকালীর দর্শন পেয়েছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দের মৃতুরূপা কালীর কবিতার মধ্যে যে আদ্যাশক্তি মহাকালীকে ধ্বংসের মধ্যে মৃত্যুর তাণ্ডব নৃত্যের মধ্যে যে ভাব তাঁকে আহ্বান করেছেন সারাজীবন স্বামীজির উত্তর সাধকরূপে সুভাষচন্দ্রও মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে মৃত্যুরূপা কালীর যে সাধনা করে আছেন যা ভারতবর্ষের ইতিহাসে অবিস্মরণীয়—অতুলনীয় হয়ে থাকবে।

—ঃঃ—

The Diverse Paths to Realizing Brahman

Professor (Dr.) Ramaprasad Bandopadhyay

Every individual's spiritual path is unique. Even within the same broader tradition, each person advances on their own path. Having resources and inspiration from a common spiritual trend, individuals gradually advance in their own spiritual field. During this journey, elements emerge from two sources: the individual's inner world and the external world. Not all practitioners of the same tradition follow a fixed pattern. This is equally true in the Shakta (worshippers of the divine feminine) tradition. The pattern of two Shakta practitioners is not identical. While there is a fundamental unity in their practices, there is also significant diversity. The same applies to the Vedantic tradition. The core belief of two Vedantic practitioners may be identical, but the intensity and depth of their realization maydiffer. Thus, variations in spiritual practice are inevitable.

The pursuit of the formless and attribute-less Brahman (the ultimate reality) depends on the individual's level of consciousness. If the seeker possesses awakened consciousness, they can realize Brahman as the supreme intelligence (Prajnana), existence-consciousness-blessing (Sat-Chit-Ananda). Otherwise, the contemplation and realization of Brahman take on a different form or level. The spiritual journey towardsBrahman is therefore dependent on the seeker's level of consciousness. Here, also, the stages and ways of practice are decided by individual uniqueness. This fact applies to all other spiritual paths as well. Every individual's spiritual path is different, and because the path is unique, spiritual practice depends on the individual. Spiritual practice is not carried out organizationally or collectively; it is inherently personal. The role of an organization or group is different. It is the individual who must attain the results of spiritual practice. Organizations or communities can provide supportive strength and companionship. They must take initiatives to ensure the individual's efforts remain unobstructed. The efforts of a group or community are primarily focused on creating a conducive environment or adding interest. Organizations can take various forms-these can exist at the social or national levels. All organizations at the societal level play a highly significant role.In the Ramayana, we see how the state fulfils its duty. The great sage Vishwamitra approaches King Dasharatha and requests that the king entrust his eldest son, Shri Ramachandra, into his care.

With his son, the mighty and valorous Ram,
The heroic one with crow-black hair, the eldest,
May he be given to me. (Ramayana, 1/19/8,9)

In Vedic yajnas (sacrificial rituals), when all the preparations weredone, and the stage of offering oblations into the sacred fire arrived, powerful demons appeared and disruptedeverything. They threw raw meat, blood, and excrement into the fire and the altar from the sky, preventing the yajna from being completed.When Sage Vishwamitra approached King Dasharatha, to request Rama for just ten nights, he informed the king that although the sages could destroy these evil forces using their spiritual powers, they did not wish to do so. It was the duty of the king to take responsibility. In reality, Sage Vishwamitra possessed divine weapons tokill the demons. He entrusted these weapons, along with their sacred mantras, to Rama. In his first fights, Rama killed the demon Tataka using his own weapons. In further battles, he used the weapons given by Vishwamitra. Rama learnt how to draw and wield these weapons from Vishwamitra. In his conflicts with Ravana, Kumbhakarna, Indrajit, and other mighty and fortunate demons, Rama made considerable use of these holy weapons.

The duty of a king or state is to create an environment conducive to an individual's spiritual pursuit. In modern times, most states have become secular, and as a result, they are neither interested nor inclined to facilitate inner spiritual growth. On the other hand, the state refrains from intervening much in an

individual's personal world. However, for a spiritual aspirant, opposing forces have now gathered within society and the marketplace. The knot in the social system has become visibly commercial, driven by transactions. Commerce has engulfed human life, influencing relationships. Calculations of give-and-take now permeate all aspects of life and relationships. Relationships are shaped by demands and exchanges. This reality exists everywhere. The pursuit of self-interest-whether by individuals or institutions-forms the foundation of connections. Relationships are woven based on whether interests are fulfilled and protected, and all of this depends on individual support.

Spiritual practice is an individual's treasure; hence, one must decide whether to allow commerce, which demands cooperation in every aspect of life, to infiltrate the spiritual domain as well. This choice depends on one's inner disposition. One must understand what one truly seeks. If worldly desires remain among one's priorities, reliance on external forces arises, giving commerce its foothold. For someone who seeks only God, all other distractions fade. Grand ambitions-establishing oneself, fulfilling personal desires, or achieving recognition-become meaningless to such an individual. As long as worldly aspirations persist-no matter what form they take-God remains distant. Walking hand-in-hand with worldly pursuits can yield fame, success, and great ventures, but the realization of the Supreme (Brahman) remains elusive and speculative.

One must introspect and identify what they truly seek. Sage Vishwamitra told King Dasharatha that neither Dasharatha nor his vast army of soldiers, elephants, and chariots were capable of subduing the demons. Only Rama could accomplish this task, for the demons were destined to be slain by Rama's hand. The fifteen-year-old youthful Rama alone was far more capable than the king and his massive army because he is none other than Rama-the one who is as tender as a fresh blade of grass. Rama's awakening is essential. The awakening of Rama within one's innermost heart prepares the aspirant for the open path of spiritual practice and the attainment of Brahman.

"Hand over your eldest son, Ramachandra, who is as mighty as a lion, the embodiment of truth, and unparalleled in beauty,"—this is the demand of Sage Vishwamitra. The reason behind this request is that powerful demons are creating severe disturbances and atrocities in the sages' penance and sacrificial rites (yajnas) in the forest hermitages. Demons like Tataka, Maricha, and Subahu are disrupting the sacrificial rituals just as they are about to be completed. They are showering blood, flesh, and filth upon the sacrificial fires, thereby defiling the yajnas. Although the sages could have dealt with these demons using their own spiritual powers, the matter falls under the jurisdiction of the king. Hence, they approach King Dasharatha.

Despite having pledged to fulfil any wish of Sage Vishwamitra, King Dasharatha becomes hesitant. Ram is only fifteen years old and has no experience of battle. The king firmly believes that it would be impossible for Ram to confront and defeat the mighty demons. Therefore, Dasharatha pleads for an alternative and offers to go himself, accompanied by his vast army and other forces, to annihilate the demons.

Vishwamitra, however, insists that only Ram can accomplish this task; it is impossible for anyone else. He becomes annoyed and displeased with the king's hesitation. Eventually, with the intervention and assurance of Sage Vashistha, King Dasharatha agrees to send Ram. Ram and his brother Lakshmana then accompany Vishwamitra into the forest.

After visiting various hermitages and traveling along the path, Ram begins his demon-slaying mission, starting with the ferocious Tataka. One after another, Ram and Lakshmana defeat and destroy the demons, freeing the sages' hermitages from fear.Vishwamitra's hermitage is called Siddhashrama, a place of great spiritual significance. It is said that Lord Vishnu Himself performed penance here for thousands of years. In His incarnation as Vamana (the dwarf), He undertook prolonged penance in this very place. Sage Vishwamitra's hermitage, therefore, holds immense sanctity.However, the demons were oppressing and

obstructing the sage's penance and sacrificial rites, which is why Vishwamitra sought Ram's assistance.

The Steps of Sadhana :

The first stage of sadhana (spiritual practice) is selection or choice. The more accurate and sincere the selection, the smoother and more fulfilling the path of sadhana will become.The second stage of sadhana is contemplation. This stage proceeds along the chosen path. It establishes the individual within the flow of contemplative union (manan yoga). It is an inner process of the individual.The third stage of sadhana is devotion (anurag). A person full of devotion not only creates an inner environment but also an external atmosphere. As devotion deepens, it turns the chosen path into the sole focus.The fourth and final stage of sadhana is surrender (samarpan). In surrender, the seeker's or devotee's journey comes to completion. After this, the seeker no longer colors their existence with individuality. Gradually, the flame of distinctness fades away, ultimately dissolving completely into full extinction or absorption.

The First Stage of Sadhana: Choice or Selection :

The nature of one's spiritual path or life of sadhana depends on this initial stage of selection. Individuals belonging to different philosophical schools make this choice based on their respective beliefs. Followers of Shakta, Vaishnava, Vedanta, Shaiva, and other traditions select their path according to their own doctrines. This selection process has various dimensions and aspects, such as choosing between the saguna (with form) or nirguna (formless) concept of God, or something else entirely.

Those who desire God in their lives have already passed this initial stage of selection. For the seeker, questions like whether God exists or not, and if He does, in what form He exists, are irrelevant. The seeker desires God and has dedicated their choice to Him. However, this initial choice carries both careful deliberation and elements of carelessness. One who has chosen God may not yet consider Him their sole focus. Except in rare cases, this choice does not become truly meaningful, as seeking God often remains symbolic.

In most cases, alongside the desire for God, there remain other desires-worldly achievements such as wealth, power, fame, and reputation. Subtle aspirations also linger, such as feeding one's ego through the establishment of certain names or symbols. There is also the inclination to align one's preferences or ambitions with acts of service, sacrifice, or self-denial.In this stage of selection, the ego plays a dual role-it can either support the process or act as an obstacle.

The first role of the ego's supportive function lies in active participation in selection. At this stage, selection becomes essential for the individual because their spiritual thirst gains the support and collaboration of the ego. Consequently, the choice aligns with the individual's values, nature, and preferences. That is, the path chosen and its ultimate goal, based on values, nature, and preferences, aids in the individual's spiritual awakening. For instance, someone with a Vaishnavite upbringing and disposition may find Vedanta unsuitable.

When the ego's radiance is involved in the selection process, the individual gradually moves towards the correct choice through judgment and analysis. Values can be easily recognized through the light of the ego. These values are reflected in the individual's character and behaviour and are often quite prominent. There are two kinds of influences of values: long-term or permanent influence and short-term or temporary influence. Permanent influences are manifested in an individual's character traits, while temporary influences are reflected in their behaviour. At times, behaviour aligns with character, but sometimes it does not.

Behaviour that aligns with character is eternal and rooted in the individual's inherent truth of existence. On the other hand, behaviour that contradicts character is short-lived. Non-characteristic behaviour is often imposed and, in some cases, reflects the individual's distracted thoughts. When an individual regulates and presents their behaviour with a specific goal in mind, influenced by external circumstances or situations,

that behaviour becomes artificial.

Natural behaviour aligns with one's character. For example, a fundamentally good and honest person may commit a wrongful act under momentary temptation. This instance illustrates an artificial behaviour where the individual suppresses their inherent character traits and prioritizes temporary gain or benefit. Consequently, the individual becomes entangled in a web of artificiality, making escape difficult. To return to their true aspirations, the individual must now exert considerable effort and meditation.

The selection of the sadhana path and its goal is a long-term process. Therefore, it is essential to discover it through a path that aligns with one's character and conduct. Even when traditions (samskaras) are reviewed, several dimensions of this process are revealed. However, this is not the place for an elaborate discussion. Our responsibility is to understand the fundamental tendencies of tradition and the essential traits of character and, on that basis, complete the selection process.

The methods discussed so far are logical approaches. Step by step, they help ensure that the selection aligns with the individual's traditions, taste, and character. However, this is not always the case. While this method is suitable in most situations, it may not apply universally. Selection can also occur spontaneously. Sometimes, through one's natural wisdom or the awakening of latent devotion within, the choice is made in a moment. Even in a completely unique and unconventional life, the path of spiritual aspiration (adhyatmikabhipsa) may suddenly crystallize in the mind. It is along this path that the individual awakens their eternal wisdom or amplifies the flow of dormant devotion. This sudden or spontaneous awakening is a result of divine grace (bhagavatikripa).

Regardless of the method of selection, the next stage that begins immediately after is the stage of contemplation (manan).

The Second Phase of Sadhana : Contemplation

One who seeks only God in life, yearns for the realization of Brahman, and is eager to serve the divine, must pass through the phase of contemplation. Whether one follows the path of knowledge (jnana), devotion (bhakti), or yoga, contemplation is essential. Some describe the phase of sadhana as a battle - the battlefield of spiritual practice. Others call it the gradual descent of divine grace. Some view it as the rise and movement of dormant spiritual energy (chaitanyashakti) along the sushumna path, ultimately leading to the sahasrara. Others perceive it as a heavenly atmosphere where one becomes an eternal servant of the divine.

Struggle is inevitable in the phase of sadhana. The Upanishads reveal a unique method:

> "Taking the bow of the Upanishadic great weapon,
> Place upon it an arrow sharpened through meditation.
> Draw it back with a mind absorbed in the essence of That,
> And strike the target, which is the Imperishable, O gentle soul."
>
> (Mundaka Upanishad 2.2.3)

[Using the great mantra of the Upanishads as a mighty weapon, one must constantly sharpen the arrow of meditation. With the mind directed towards divine essence, focus must remain unwavering upon the imperishable Brahman.]

Immediately afterward, the Upanishad emphasizes contemplation once again:

> "The sacred syllable Om is the bow,
> The self is the arrow, and Brahman is the target.
> With unwavering attention,
> One must strike the target and become one with it,
> like an arrow merging with its mark."
>
> (Mundaka Upanishad 2.2.4)

[Om is the bow, the self is the arrow, and Brahman is the target. Only through unwavering and devoted meditation can one reach and touch the divine.]

Contemplation is the weapon through which the realization of Brahman is achieved by deep, continuous meditation. This is a struggle because the practice of contemplation demands intense effort from the seeker. The struggle occurs both within the inner world and the outer environment. At every stage of this struggle, personal impressions (samskaras) and surrounding conditions influence the seeker. The declaration "the target is set" does not guarantee that the goal is truly fixed. Once the target is genuinely determined, the spiritual awakening process begins immediately.

The concentration required to set the target demands prolonged preparation. Arjuna's unwavering focus during his famous arrow shot is a fitting example. The ability to strike the target requires absolute absorption - this is known as "sharavattanmaya" (becoming one with the arrow). The gaze must remain so fixed on the target that it does not waver elsewhere.

One who sets Brahman as the ultimate goal of life must become absorbed in the essence of Brahman. Constant contemplation of Brahman transforms the atmosphere of the mind. Overcoming the mind's natural inertia, it gradually radiates with the light of consciousness. The seeker's determination solidifies as the mind aligns itself with spiritual awakening and conduct.

Eventually, the mind becomes adept in the realization and pursuit of Brahman. Not only does the mind foster the essence of Brahman, but it grows and develops by taking refuge in that essence. This is the phase of contemplation. In this stage of contemplation, the seeker gradually perceives Brahman as the ultimate and only truth. In the brilliance and sharpness of contemplation, the mind desires nothing else. The mind is now directed towards Brahman, towards the divine.

Riding the chariot of devotion, carrying knowledge like grass in hand, the mind is now engaged in struggle. This struggle in the process of contemplation ends in wholeness. It does not merely begin with struggle and end with it. There was a battle, there is still a battle - a battle with one's inert nature, a battle with opposing tendencies and influences, a battle between the divine part of the mind and its material part. But the outcome lies not in the battle itself, but in harmony - where knowledge and devotion become one. In the intensity and sharpness of contemplation, the distinction between paths fades. At that point, all paths merge into Him. Knowledge, devotion, and yoga join hands and proceed in search of Brahman, in pursuit of the divine.

To keep contemplation alive, to make it intense and sharp, some path is necessary. Regardless of which path we choose, ultimately contemplation itself becomes the chariot of that path. This chariot does not stop after initiating the process but gradually deepens and intensifies contemplation. Contemplation becomes profound. Despite all external obstacles to the mind, contemplation remains.

Contemplation depends not only on the individual but also, in many cases, on the environment. Both the inner environment of the individual and the external environment influence the process of contemplation. What we think, do, say, where we are, how we are, and the condition of others - all of these manifests and stir the outer layers of the mind. Through contemplation, the spiritual gateway of the individual gradually opens. Contemplation is like a staircase to the roof. Climbing the stairs of contemplation builds a connection with Him, and gradually this connection becomes inseparable.The devotee then sees only the beloved deity and engages in their service. The wise bathe in the radiant knowledge of Brahman, while the yogi remains immersed in the essence of the Supreme Brahman. Contemplation strengthens and smooths this journey.

—::—

সত্যের পথ

প্রাপ্তিস্থান ঃ কোলকাতা ও অন্যত্র।

(1) বেলঘরিয়া 1 No. Platform, কোলকাতা – 56

(2) বেলঘরিয়া 2 No. / 3 No. Platform
কোলকাতা – 56

(3) বারাকপুর রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে।

(4) **বিশ্বনাথ চক্রবর্তী,** নৈহাটি রেল স্টেশন
4 No./5 No. Platform

(5) **গীতা সাহিত্য মন্দির**
হালিশহর রেল স্টেশন 2 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(6) **বাপ্পা বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে
(কল্যাণী লোকাল যে Platformএ দাঁড়ায়) নদীয়া

(7) **শ্যামল বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন 1 No. Platform, নদীয়া

(8) **সাধনা বুক স্টল**
বারাসাত রেল স্টেশন 3 No. / 4 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(9) ব্যাণ্ডেল রেল স্টেশন Platform, হুগলী

(10) **জৈন বুক স্টল**
শ্রীরামপুর রেল স্টেশন 4 No. Platform, হুগলী

(11) শিয়ালদহ রেল স্টেশন (নর্থ), কোলকাতা

(12) **রতন দে বুক স্টল**
যাদবপুর মোড়, কোলকাতা

(13) **সন্তোষ বুক স্টল**
নাগের বাজার, কোলকাতা

(14) **শ্যামা স্টল**
টালীগঞ্জ মেট্রোর সামনে, কোলকাতা

(15) **তপা চক্রবর্তী,** চিড়িয়ামোড়, কোলকাতা

(16) গোলপার্ক মোড়, কোলকাতা – 29

(17) **বিরাটী রেলওয়ে বুক স্টল,** কোলকাতা

(18) **সর্বোদয় বুক স্টল**
হাওড়া স্টেশন

(19) লেকটাউন থানার নীচে
কোলকাতা – 89

(20) বাগবাজার উদ্বোধন কার্যালয়ের উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(21) বাগবাজার মায়ের বাড়ীর উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(22) **বাবু বুক স্টল**
সিঁথির মোড়, কোলকাতা

(23) **দমদম ক্যান্টনমেন্ট বুক স্টল**
কোলকাতা

(24) **কালী বুক স্টল**
শোভাবাজার মেট্রো, কোলকাতা

(25) **সুব্রত পাল**
সল্টলেক পি.এন.বি., ব্লক-বি.এ., কোলকাতা।

(26) **সল্টলেক** 4 No. **ট্যাঙ্ক,** কোলকাতা

(27) **নস্কর বুক স্টল,** AB/AC মার্কেট (সল্টলেক)

(28) **নরেশ সাউ,** বৈশাখী মোড়, কোলকাতা।

(29) **দেবাশিষ মণ্ডল,** জি.ডি. মার্কেট, সল্টলেক

(30) **আশিষ বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(31) **চ্যাটার্জী বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(32) **টি দত্ত,** কুমার আশুতোষ (মেন) স্কুলের পাশে

(33) **মন্মথ প্রিন্টিং**
জপুর রোড, দমদম, কোলকাতা-৭০০ ০৭৪

(34) **পণ্ডিত এস. কে. ব্যানার্জী,** বিশিষ্ট পুরোহিত
দেশবন্ধুপাড়া, বৌবাজার, শিলিগুড়ি-৭৩৪ ০০৪
মোবাইল ঃ ৮৯৭২৮০৭৮৫৪, ৯০৬৪৬৩৬১০২

SATYER PATH
1st June 2025
Jaistha–1432
Vol. 23. No. 2

REGISTERED KOL RMS/366/2025-2027
Regn. No. WBBEN/2006/18733

Price : Rs. 5/-

দিব্য সাধন ঃ পার্থিব জীবনেই ঈশ্বরলাভ

বেদ, উপনিষদ, ভাগবত, ব্রহ্মসূত্র ও ভাগবত গীতা অবলম্বনে

আলোচনায় ঃ অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্-লাইনে দিব্য জীবন ও সাধনার ক্লাস চলছে ঃ—

রবিবার : ১লা জুন, ২০২৫ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ৮ই জুন, ২০২৫ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ১৫ই জুন, ২০২৫ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ২২শে জুন, ২০২৫ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ২৯শে জুন, ২০২৫ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

প্রতি রবিবার বিকাল ৫-৩০ থেকে ৭-০০ পর্যন্ত।

যে কোন ইচ্ছুক ব্যক্তি যোগ দিতে পারেন **Android Phone**-এর অথবা কম্প্যুটারের সাহায্যে।

অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য **Invitation** দরকার।

যদি ইচ্ছা হয় তবে যোগাযোগ করুন ঃ—

শ্রী এস. হাজরা ঃ ৯১৬৩৩৯৩৬৩৩

আপনার **email id,** নাম ও **Phone Number SMS** করে পাঠান।

Website দেখুন ঃ **www.satyerpath.org**

স্থান : ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি (চতুর্থ তল)
কলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ : ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

Printed and Published by Bibudhendra Chatterjee, Printed at Classic Press, 21, Patuatola Lane, Kolkata–9 and Published at Satyer Path, 21, Patuatola Lane, Kolkata–700 009.
Editor : Dr. Ramaprosad Banerjee, DL-11/5, Salt lake City, Kolkata–700 091.